Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিরাজাম মুনিরা

রোলঃ 228021089

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিরাজাম মুনিরা

রোলঃ 228021089

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সিরাজাম মুনিরা, আইডিঃ 228021089 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sirazum Munira

(স্বাক্ষর)

সিরাজাম মুনিরা

আইডিঃ 228021089

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অবতরণিকা..5

প্রথম অধ্যায় - ইসলাম : একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা...7

দ্বিতীয় অধ্যায় - ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়...13

তৃতীয় অধ্যায় - মুসলিম জীবনের স্বরূপ: ইসলামি সমাজ ও সামাজিকতা 21

চতুর্থ অধ্যায় - ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব..30

পঞ্চম অধ্যায় - উপমহাদেশীয় সমাজ বাস্তবতায় ইসলামি সংস্কৃতি..................................37

ষষ্ঠ অধ্যায় - রেওয়াজের আবর্তে হারিয়ে যাওয়া ইসলাম...45

সপ্তম অধ্যায় - অন্ধ অনুকরণে সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি: আধুনিক মুসলিম সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়...50

অষ্টম অধ্যায় - উত্তরণের উপায় : ইসলামি জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন (কর্মপরিকল্পনা ও নেতৃত্ব) 56

শেষ কথা..61

গ্রন্থপঞ্জি...62

অবতরণিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা তাঁরই সাহায্য ও ক্ষমা চাই।

বর্তমান মানবসভ্যতা মুখোমুখি এক বিস্তৃত মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অস্থিরতার। আমরা এমন সব সমস্যা দেখছি, যার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, সমাধান এবং উপলব্ধির । সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু তার গতি সর্বত্র সমান নয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পরিবর্তনের তীব্রতা বিভিন্ন হলেও, একটি বিষয় নিশ্চিত—মানবজীবনের গতিশীলতা এবং মানসিক চাপ আজ অতীতের তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলামি সমাজও এই পরিবর্তনের বাইরে নয়। যুগে যুগে প্রথা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিকতার সঙ্গে সংঘাত তৈরি করে। কিন্তু এই পরিবর্তন কি প্রকৃতপথে এগোচ্ছে, নাকি সমাজকে বিচ্যুত করছে—এটি আজকের মুসলিম সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে শক্তিশালী প্রভাববলয়গুলোর এক ত্রিমুখী টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়, আর তা হলো—সামাজিক নিয়ম-কানুন ও রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক আকর্ষণ ও প্রভাব, এবং ইসলামের নির্দেশনামূলক পথ।

সমাজ মানুষকে একভাবে চলতে শেখায়, সংস্কৃতি তাকে আরেকভাবে প্রভাবিত করে, আর ইসলাম তাকে দেখায় সম্পূর্ণ ভিন্ন — কিন্তু এক অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ পথ। এদের পার্থক্য মানুষের ভেতর তৈরি করে একটি অদৃশ্য দ্বন্দ্ব।

এখানেই মূল প্রশ্নটি সামনে চলে আসে—

সমস্যাটি কি ইসলাম, না কি আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির দুর্বলতা?

অধুনা মুসলিম সমাজের একটি বিশাল অংশই ইসলামি সংস্কৃতির প্রকৃত কাঠামো সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে না। ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা সমাজ, অর্থনীতি, নেতৃত্ব, নৈতিকতা, পরিবার, রাষ্ট্র—সবকিছুকে ধারণ করে—তা অনেকের কাছেই অস্পষ্ট। এর ফলে মানুষ তাদের দেখা সবচেয়ে দৃশ্যমান বিকল্প—পশ্চিমা ভোগবাদী সমাজব্যবস্থাকে স্বাভাবিকভাবে "সম্ভাব্য আদর্শ" ধরে নেয়।

ইতিহাসে এ ধরনের বিভ্রান্তি নতুন নয়।

উপমহাদেশে এমন ইতিহাসও আছে যেখানে শাসকেরা মানুষের পোশাকের অধিকার পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেছে—যেমন দাড়ি রাখতে গেলে বা ব্লাউজ পরতে গেলে আলাদা কর দিতে হত। শাসকদের সংস্কৃতি সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো শক্তির মাধ্যমে। কিছু সুবিধা থাকলেও, সেই সংস্কৃতি মানুষের ঈমানি পরিচয় তিলে তিলে দুর্বল করে দিত, পরিবার-ব্যবস্থায় আঘাত হানত এবং সামাজিক শেকড়কে দূর্বল করে দিত।

আজও এই দ্বন্দ্ব বিদ্যমান আছে, তবে বিজাতীয় প্রভাব এখন আর সরাসরি নয়—বরং আরো সূক্ষ্ম, গভীর এবং পরোক্ষভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে প্রবেশ করছে।

আজকের নেতৃত্বের বড় অংশ পশ্চিমা আদর্শের অনুসরণে সমাজকে পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-কানুন, সামাজিক রীতিনীতি—সবকিছুতে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে ভোগবাদী আদর্শিক মডেলকে। মিডিয়া, শিক্ষা, বিনোদন, প্রযুক্তি—সব মিলিয়ে পশ্চিমা মূল্যবোধ এখন একটি নীরব শিক্ষক।

অন্যদিকে ইসলামকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে শুধুই কিছু ব্যক্তিগত ইবাদত—সালাত, সিয়াম, দোয়া—এর সীমায়। ফলে মানুষ ভাবছে ইসলাম সহজ নয়, সমস্যা তৈরি করে বা আধুনিক সমাজের সাথে তাল মেলাতে অক্ষম।

কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত—

ইসলাম হলো সেই পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যা সর্বকালের, সব যুগের মানুষকেই আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক—সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য দিতে সক্ষম।

ইসলামি জীবনবিধান মেনে চলা কঠিন নয়; বরং বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাই ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে তা কঠিন করেছে।

তাই এ গবেষণার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে—

- ইসলাম, সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্ককে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যার
- ইসলাম কেন কেবল আচার-বিধান নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও জীবনব্যবস্থা —তা পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করার
- পশ্চিমা সভ্যতার কতিপয় সুফল-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তার নৈতিক শূন্যতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষতির দিকগুলো চিহ্নিত করার
- আধুনিক বিশ্বের সংকট মোকাবেলায় ইসলামের গুরুত্ব তুলে ধরার
- মুসলিম সমাজব্যবস্থা কেমন হবে এবং কারা নেতৃত্ব দেবে—এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার

মুসলিম সমাজ আজ এসে দাঁড়িয়েছে এক দ্বিমুখী পথে— যার একদিকে বস্তুবাদী সভ্যতা প্রভাবিত সমাজজীবন ও সাংস্কতিক আগ্রাসনের টানাপোড়েন—যেখানে তাকে তার পরিচয়, ইতিহাস ও বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে।

অন্যদিকে তার নিজের দীন ইসলাম—যা তাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের সফলতার পথ দেখায়।

এই গবেষণা সেই পথিককে তার প্রয়োজনীয় বোধ, যুক্তি এবং স্পষ্টতা দিতে চায় যাতে সে বুঝতে পারে সে কে, কোন সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করছে, এবং কোন জীবনব্যবস্থা তাকে প্রকৃতভাবে সম্মান ও নিরাপত্তা দেয়।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা এই লেখনীর মাধ্যমে আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন।

প্রথম অধ্যায় - ইসলাম : একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

ইসলামের পরিচয়

‘ইসলাম’’ শব্দের অর্থ “আত্মসমর্পণ”, “শান্তি” ও “পরিপূর্ণ আনুগত্য”। কুরআনের ভাষায় ইসলাম হলো—আল্লাহ্‌র একত্বকে স্বীকার করে তাঁর নির্দেশে জীবন পরিচালনার নাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

—“*ইসলাম হল, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযানের রোযা পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ পৌছার সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ পালন করবে।”(সহীহ মুসলিম)*

ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট জাতি, যুগ বা ভূগোলের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; এটি সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য একটি সমন্বিত জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের উদ্দেশ্য, পরিচয় ও কর্তব্য—সবকিছুর মৌলিক ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে দেয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন—

“إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ”

— *“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম।”* (আলে-ইমরান: ১৯)

এই আয়াতই স্পষ্ট করে দেয়—ইসলাম কেবল আচার-অনুষ্ঠানের ধর্ম নয়; বরং এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের বিশ্বাস, চরিত্র, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, ন্যায়বিচার—সবকিছুকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সাজায়।

ইসলাম এমন এক আদর্শিক ভিত্তি দেয়, যা বিশ্বাস (ইমান) এবং কর্ম (আমালুস সালিহাত) কে অবিচ্ছেদ্য করে তোলে। এই পূর্ণাঙ্গতাকে অস্বীকার করার কারণেই মুসলিম সমাজে এক আদর্শিক সংকট তৈরি হয়েছে, যেখানে তারা ভোগবাদী সমাজব্যবস্থাকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে ধরে নেয় এবং নিজেদের দ্বীন ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য এই হীনমন্যতা পরিত্যাগের কোনো বিকল্প নেই।

ইসলামের দার্শনিক ভিত্তি

ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা দুটি মৌলিক দার্শনিক স্তম্ভের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত- তাওহিদ ও আখিরাত।

১. তাওহিদ: আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব

তাওহিদ কেবল আল্লাহ্‌র একত্বের আকিদাগত ঘোষণা নয়; এটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি।

মানব-সৃষ্ট সভ্যতার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো—তাদের নৈতিকতা পরিবর্তনশীল।সার্বভৌম ক্ষমতাকে যখন মানুষের (পার্লামেন্ট, জনগণ) বা বস্তুবাদী মতবাদের হাতে অর্পণ করা হয়, তখন সেই ক্ষমতা স্বার্থপরতা ও অস্থিরতার শিকার হয়।আজ যা বৈধ, কাল তা অবৈধ; সমাজ ও ক্ষমতার চাপে নীতি বদলে যায়।

অন্যদিকে ইসলাম তাওহিদের ভিত্তিতে নৈতিকতা স্থির করে, যেখানে সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর।

তাঁর বিধান অন্যায়, শোষণ বা স্বার্থপরতার অধীন নয়।

কুরআনে এরশাদ হয়েছে—

“أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ”

— *“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি সবচেয়ে ভালো জানেন না?”* (আল-মুলক: ১৪)

যে স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার নীতি নির্ধারণে সর্বোত্তম। এই নৈতিক সার্বভৌমত্বই ইসলামকে স্থায়ী ও ভঙ্গুরতাহীন নীতিতে পরিণত করে।

২.আখিরাত: নৈতিকতা ও সামাজিক ভারসাম্যের নিশ্চয়তা

আখিরাতে বিশ্বাস বা পরকালীন জীবনে জবাবদিহিতার ধারণা ইসলামি জীবনব্যবস্থায় নৈতিক শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের মূল চালিকাশক্তি। আধুনিক সভ্যতা যেখানে ইহলৌকিক ভোগ ও শক্তিকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করে, ইসলাম সেখানে পারলৌকিক জীবনের অগ্রাধিকার দিয়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে শুধুমাত্র দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বার্থে নয়, বরং পরকালের জবাবদিহিতার ভয়ে ন্যায় ও সততা বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত করে। এই কারণেই ইসলামে ইমানকে সর্বদা আমালুস সালিহাত (ন্যায়ভিত্তিক কাজ)-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন-

“ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ”

— *“যারা ঈমান এনেছে এবং ন্যায়ভিত্তিক কাজ করেছে।”* (সুরা আল-বাকারাহ: ২)

এই আধ্যাত্মিক সংযোগ সমাজে সংঘাত সৃষ্টিকারী শোষণ ও সীমালঙ্ঘন থেকে ব্যক্তিকে বিরত রাখে, যা নৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য জরুরি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর নির্দেশনা পারিবারিক স্তর থেকে শুরু করে বৃহত্তর সমাজে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করে।

ইসলামের অনন্যতা

১. মানবজীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যের সঠিক ব্যাখ্যা

কুরআন জানায়—মানুষকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি—

"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"

— *"মানুষ ও জিনকে আমি সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য।"* (আয-যারিয়াত:৫৬)

এ ব্যাখ্যা একজন মানুষকে জানিয়ে দেয় তার অস্তিত্বের প্রকৃত দিশা ও পরিচয় কী।

আর এ ইবাদত মানে শুধু সালাত নয়; বরং মানুষের সকল কাজ, সিদ্ধান্ত এবং নৈতিক আচরণ—যা আল্লাহর আইন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়—সবই ইবাদত। ইসলামের পাঁচটি রুকন (স্তম্ভ) মূলত এই ইবাদতেরই ব্যবহারিক প্রয়োগ, যা মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালনার ভিত্তি তৈরি করে।

২. মানুষের পূর্ণ বাস্তবতাকে ধারণকারী একমাত্র জীবনব্যবস্থা

মানুষ একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক, মানসিক, জৈবিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাণী। আধুনিক পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের এই বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে টুকরো করে—ধর্মকে ব্যক্তিগত কক্ষে সীমাবদ্ধ করে, নৈতিকতাকে আইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ও মানবিক মূল্যবোধকে বাজার অর্থনীতির হাতে তুলে দেয়।

ইসলামই একমাত্র ব্যবস্থা যা মানুষের সব দিকের চাহিদাকে পূর্ণভাবে দেখতে পারে—মানুষের আত্মা, মন, শরীর, পরিবার, অর্থনীতি, নেতৃত্ব—সবই এতে সংহত।

জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলাম

ইসলামের প্রয়োগ জীবনের প্রতিটি স্তরে —

ক. ব্যক্তিগত জীবনের শৃঙ্খলা

- **সালাত ও সাওম:** এই ইবাদতগুলো আত্মসংযম, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ শেখায়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময় ও শৃঙ্খলার বাধ্যবাধকতা তৈরি করে, আর সাওম সহমর্মিতা ও ধৈর্যের ভিত্তি গড়ে।
- **ইমান ও চরিত্র:** ইমানে বিশ্বাস কেবল ক্বালবের(অন্তর) পবিত্রতাই নয়, বরং বাহ্যিক চরিত্রের সৌন্দর্যও নিশ্চিত করে।

খ. পারিবারিক জীবন

পরিবার হলো সমাজের মৌলিক একক। স্ত্রী, সন্তান ও পিতামাতার প্রতি সম্মান, ন্যায় ও দায়িত্ব পালন ইসলামী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف"

—*"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করো।"* (সুরা আন-নিসা: ১৯),

সেইসাথে মহান আল্লাহ্ মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহারের কথাও জোরালোভাবে আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

" وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"

— "*তোমার রব আদেশ করেছেন যে তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদব্যবহার করো।*" (সুরা ইসরা: ২৩)।

এভাবে পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার জীবনের পূর্ণতা আনে।

গ. সামাজিক জীবন

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক জীবন শুধু ব্যক্তি-সম্পর্কের সমষ্টি নয়, বরং এটি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ মুমিনদের ভ্রাতৃত্বের ওপর জোর দিয়েছেন-

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة "ٌ

— "*মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই।*" (সুরা আল-হুজুরাত: ১০)।

এই ভ্রাতৃত্ববোধ সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়াও, সমাজের প্রতি দায়িত্বের অংশ হিসেবে প্রতিবেশীর অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে;

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ"

— "*যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।*" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব)।

এভাবে সামাজিক জীবনে সুবিচার এবং উত্তম আচরণ বজায় রাখার মাধ্যমেই একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ. অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও বৈষম্য নিরসন

ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি যাকাত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণমুক্ত ব্যবস্থা ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। ইসলামি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হলো—

- **সুদ (রিবা) বর্জন ও স্বচ্ছতা:** ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ (ربا) এবং প্রতারণা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে, যা সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নৈতিকতা নিশ্চিত করে।
- **যাকাত ও মীরাস:** যাকাত ও মীরাস ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায় এবং সমাজের দুর্বল অংশের প্রতি দায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়, যা অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি করে।

ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল হলো পুঁজিবাদের শোষণমূলক ব্যবস্থার কার্যকর বিকল্প। ইসলামের দৃষ্টিতে, ব্যবসা শুধু লাভের জন্য নয়, বরং তা হতে হবে নৈতিকতা ও ইনসাফের ভিত্তিতে:

হাদীসে এসেছে-

" التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"

— "*সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবি, সিদ্দীক ও শহীদের সঙ্গে অবস্থান করবে।*" (সহীহ তিরমিজি)

ঙ. রাজনৈতিক জীবন ও নেতৃত্ব

ইসলামে নেতৃত্ব কোনো ক্ষমতা ভোগ বা স্বৈরাচারের মাধ্যম নয়, বরং এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্পিত আমানত (Trust), যার লক্ষ্য জনকল্যাণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন –

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

—"*তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি নেতা তার প্রজাদের প্রতি দায়িত্বশীল, এবং সে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।*"

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে পরামর্শ (শূরা - شورى) ভিত্তিক নীতি নিশ্চিত করে ন্যায় ও জবাবদিহিতা: কুরআনে বলা হয়েছে -

"وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم"

—"*তাদের বিষয়গুলো পরস্পরের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।*" (সুরা আশ-শুরা: ৩৮)

ইসলামের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা : ইজতিহাদ ও সহজতা

ইসলাম যুগের পরিবর্তনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং এ পরিবর্তনকে সঠিক পথে পরিচালনা করার শক্তি রাখে। কুরআন ও সুন্নাহ অপরিবর্তিত ভিত্তি হিসেবে রয়েছে—আর পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে সামাল দিতে ফিকহ, কিয়াস, ইজমা ও ইজতিহাদের মতো পদ্ধতিগুলো ইসলামী আইনকে যুগোপযোগী রাখে। ফলে ইসলামের মূলনীতি চিরন্তন হলেও এর প্রয়োগ সর্বদা জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত।

১. ইজতিহাদ

ফিকহ হলো ইসলামি আইনশাস্ত্র, যা কুরআন ও সুন্নাহর গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবহারিক জীবনের জন্য বিধান বের করে। নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ আলেমদের প্রচেষ্টা, যাকে **ইজতিহাদ (اجتهاد)** বলা হয়, ইসলামের বিধানকে গতিশীল রাখে।

এই গতিশীলতা বিধানের উৎসসমূহের ওপর নির্ভরশীল:

- **কিয়াস (قياس):** তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন সমস্যার সমাধান।
- **ইজমা (إجماع):** নির্ভরযোগ্য আলেমদের ঐকমত্যের মাধ্যমে বিধান প্রতিষ্ঠা।

২. সহজতা

ইসলামি ব্যবস্থা মানুষকে এমন কোনো অসম্ভব দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় না, যা তারা বহন করতে অক্ষম। ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হলো **সহজতা (يُسر)**। ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের সাফল্য নিশ্চিত করার পথ দেখায়।

কুরআনে বলা হয়েছে—

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْؕ

—"*আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব আরোপ করেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার অর্জিত কাজের প্রতিফল পাবে এবং ভুল বা অপরাধ করলে তাকেই দায় বহন করতে হবে।'*'(সূরা বাকারা:২৮৬)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানুষের জীবনকে জটিল নয়, বরং ভারসাম্যপূর্ণ ও সহজতর করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের সাফল্য নিশ্চিত করে।

সভ্যতার টিকে থাকার শর্ত

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম কোনো বিচ্ছিন্ন বিশ্বাস নয়, বরং একটি সুসংহত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা তার তাওহিদ-ভিত্তিক দার্শনিক ভিত্তি এবং ফিকহ-এর অভিযোজন ক্ষমতার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত থেকে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ, নৈতিক ও ইনসাফভিত্তিক সমাধান সরবরাহ করে,যাতে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জগতে সফল হতে পারে।

মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে যে তিনটি ভিত্তি প্রয়োজন—নৈতিকতা, ন্যায়ভিত্তিক শাসন, ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য—তা ইসলাম একই ব্যবস্থার ভেতরে স্থাপন করে। তাই ইসলাম শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়, মানবসভ্যতার বেঁচে থাকার শর্ত।

একজন মুসলিমের উচিত মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখা এবং স্বকীয়তা নিয়ে গর্ব অনুভব করা। আর এই আত্মমর্যাদাবোধ তখনই অর্জিত হবে, যখন ইসলামকে জীবনের সামগ্রিক পথনির্দেশনা হিসেবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়

সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারণা

মানব সমাজ এবং তার সম্মিলিত জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার লক্ষ্যে মানুষের মনন ও শ্রমের ফসল হলো সংস্কৃতি ও সভ্যতা। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই দুটি ধারণা একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হলেও এদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষের জীবনধারার অবস্তুগত (non-material) এবং বস্তুগত (material) এই দুটি দিককে যথাক্রমে সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধারণ করে।

সংস্কৃতি (Culture): মানুষের অবস্তুগত সৃষ্টি ও মননশীলতার বিকাশ

সংস্কৃতি বা ইংরেজিতে 'culture' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ *'cultura'* থেকে, যার মূল অর্থ হলো 'যত্ন নেওয়া বা বিকাশ সাধন করা'। এই শব্দটি মূলত কৃষি বা চাষাবাদে ব্যবহৃত হলেও, পরবর্তীতে এর তাৎপর্য মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে প্রসারিত হয়। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে এর আদি ব্যবহার ছিল 'মনের পরিশীলন' বা 'আচার-রীতি' অর্থে।

আধুনিক নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে **'কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ধরন বা রীতি'** বোঝাতে । এই ধারণাটির ভিত্তি হলো এই পর্যবেক্ষণ যে, মানুষ কেবল জৈবিকভাবে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য (যেমন হাসি-কান্না) নয়, বরং সমাজ থেকেও কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, যা সমাজভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে (কলিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া, ভলিউম ৭, ম্যাকমিলিয়ান এডুকেশনাল কোম্পানি, নিউইয়র্ক, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৫৫৮- ৫৬০)।

সংস্কৃতি হলো মূলত মানুষের অবস্তুগত সৃষ্টি। এই সৃষ্টিগুলি চোখে দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু তা মানুষের আচরণ ও মূল্যবোধকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, "মানব সমাজের যে উপাদানসমূহ মানুষের নিজের তৈরি তা-ই হলো সংস্কৃতি"। বিস্তৃত পরিসরে, এটি হলো সেই আচার-প্রথা এবং ঐতিহ্য, যা প্রতিটি মানুষ তাদের পরিবার ও সামাজিক পরিবেশে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে অর্জন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চা-শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত 'একটি কুঁড়ি ও দুটি পাতা' তোলার নিয়ম হচ্ছে অবস্তুগত সৃষ্টি হিসেবে সংস্কৃতির অন্তর্গত। এগুলি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মানসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়ে একটি সমাজের ভিত্তি তৈরি করে (সভ্যতার সংকট, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-১১)।

সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির আয়নাস্বরূপ। যে কোনো সংস্কৃতি যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তা গঠিত হয় পাঁচটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে—

১. **দুনিয়াবি জীবন সম্পর্কে ধারণা:** জীবনকে কীভাবে দেখা হচ্ছে—এটি কি কেবল পার্থিব ভোগ, নাকি এর একটি বৃহত্তর আধ্যাত্মিক লক্ষ্য আছে।

২. **জীবনের চরম লক্ষ্য:** মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কী।

৩. **বুনিয়াদী আকীদা ও চিন্তাধারা:** সমাজের মৌলিক বিশ্বাস, যেমন স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা।

৪. **ব্যক্তি প্রশিক্ষণ:** ব্যক্তির মনন, চরিত্র এবং নৈতিকতা গঠনের পদ্ধতি।

৫. **সমাজ ব্যবস্থা:** পরিবার, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সংগঠনের কাঠামো (ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৬)।

সভ্যতা (Civilization): বস্তুজগতে সংস্কৃতির রূপায়ণ

যদি সংস্কৃতিকে মানব সমাজের মনন বলা হয়, তবে সভ্যতা হলো সেই মননের ফলস্বরূপ তার বস্তুগত রূপায়ণ।

সভ্যতা বলতে বোঝায় মানুষের বস্তুগত আবিষ্কার এবং সৃষ্টির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এটি মূলত মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করার জন্য সৃষ্ট প্রযুক্তিগত উন্নতি, অবকাঠামো এবং সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে বোঝায়। এটি মানব সমাজের সেই বাহ্যিক ও দৃশ্যমান দিক, যা তার বস্তুগত অগ্রগতিকে প্রতিফলিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, চা-বাগানে চা-পাতা প্রক্রিয়াজাত করার কারখানা হলো সভ্যতার অন্তর্গত। সভ্যতার উপাদানগুলি পরিবেশকে মানুষের বাসস্থানের উপযোগী করে তোলে এবং জীবনধারণের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও দক্ষ করে তোলে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক

সভ্যতা এবং সংস্কৃতি হলো মানুষের সামাজিক জীবনের দুটি দিক—একটি ভেতরের, অন্যটি বাইরের—যা একে অপরের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, সংস্কৃতি হলো একটি সমাজের আত্মা, আর সভ্যতা হলো সেই আত্মার শরীর বা বাহ্যিক কাঠামো। সংস্কৃতিকে মানুষের অবস্তুগত সৃষ্টি বলা হয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো আমাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, সাহিত্য এবং রীতিনীতি। এই সংস্কৃতিই নির্ধারণ করে আমরা জীবনকে কীভাবে দেখব, কোনটিকে ভালো ও কোনটি মন্দ মনে করব। অন্যদিকে, সভ্যতা হলো মানুষের বস্তুগত সৃষ্টি, যেমন বড় দালান-কোঠা, শিল্প-কারখানা, প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্র এবং সুসংগঠিত আইন ও প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ, একটি সমাজের ভেতরের চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারণের পদ্ধতি যখন বাহ্যিক কাঠামো এবং প্রযুক্তিগত উন্নতিতে প্রকাশিত হয়, তখন সেই বহিঃপ্রকাশকেই আমরা সভ্যতা বলি। সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মননশীলতার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়, আর সভ্যতা সেই মননের শক্তিতে তৈরি হওয়া বস্তুগত ফল হিসেবে টিকে থাকে।

এই দুটি বিষয় নিবিড়ভাবে সংযুক্ত এবং একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন। সংস্কৃতি হলো সভ্যতার মূল ভিত্তি ও চালিকাশক্তি; কারণ একটি সমাজের মূল্যবোধ (সংস্কৃতি) তার তৈরি করা আইন,

প্রযুক্তি ও অবকাঠামো (সভ্যতা) ব্যবহারের পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি সংস্কৃতিতে পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে, তবে সেই সভ্যতা এমন প্রযুক্তি তৈরি করবে যা পরিবেশবান্ধব। একইভাবে, সভ্যতা সংস্কৃতিকে বিকশিত হতে সাহায্য করে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সভ্যতা) সংস্কৃতির জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে দ্রুত ও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং, সংস্কৃতি ছাড়া সভ্যতা কেবল একটি প্রাণহীন বস্তুগত কাঠামো মাত্র, এবং সভ্যতা ছাড়া সংস্কৃতি তার পূর্ণাঙ্গ বস্তুগত রূপায়ণ লাভ করতে পারে না। যখন কোনো সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ নৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, তখন সেই সংস্কৃতি দ্বারা সৃষ্ট সভ্যতাও ধীরে ধীরে পতনশীল হয়ে পড়ে।

মানবসৃষ্ট সভ্যতার সীমাবদ্ধতা

যদিও মানবসৃষ্ট সভ্যতা বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করে, এই অগ্রগতির মূল ভিত্তি ও নৈতিক মানদণ্ড প্রায়শই দুর্বলতার শিকার। এই বস্তুগত কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে সাধারণত বৃহত্তর মানবকল্যাণের চেয়ে আবিষ্কারক ও ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর স্বার্থ প্রবল হয়ে ওঠে।

বাস্তবে, মানুষের তৈরি যেকোনো আইন, রীতি, প্রথা বা যন্ত্রে তার প্রবর্তক বা ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর স্বার্থই মুখ্য থাকে। এর ফলস্বরূপ, মানব-রচিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষের স্বার্থরক্ষাকে মূল কথা করে তোলে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণকে উপেক্ষা করে। যেমন চা কোম্পানির মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে দৃশ্যমান বৈষম্য, তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে, নৈতিকতার অনুপস্থিতিতে স্বার্থপরতাই এই ধরনের সভ্যতার চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ভিত্তিও একইভাবে প্রথাগত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচীন ভারতের সভ্যতাকে 'সদাচার' বললেও, তিনি মন্তব্য করেছেন যে এর ভিত্তি ছিল মূলত প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে নিষ্ঠুরতা ও অবিচারই স্থান পেত। তিনি উল্লেখ করেন, এই সদাচার ছিল **"কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন"** যা **"সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ"**।

ফলে স্বভাবতই মানবসৃষ্ট সভ্যতা কেবল একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীর জন্য নিয়ম ও শৃঙ্খলা তৈরি করে বৃহত্তর মানবসমাজের জন্য সার্বজনীন কল্যাণ বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়।

ইসলামি সংস্কৃতির পরিচয় ও ভিত্তি

ইসলামি সংস্কৃতি হলো প্রচলিত ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র জীবনধারা। এটি এমন ঐতিহ্য ও রীতিনীতির সমন্বয়ে গঠিত যা ইসলামের সঠিক ও মৌলিক শিক্ষার অনুসরণে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে।

ইসলামি সংস্কৃতিকে নিছক একটি 'ধর্ম' বা 'আচার-সর্বস্ব প্রথা' হিসেবে দেখা যায় না। এটি হলো একটি **ব্যাপক জীবনব্যবস্থা (Comprehensive System of Life)** যা মানুষের জীবনের

প্রতিটি দিককে আবৃত করে। এই সংস্কৃতির লক্ষ্য শুধু আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়, বরং পার্থিব জীবনেও একটি ন্যায়ভিত্তিক ও পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামি সংস্কৃতি বনাম মুসলিম সংস্কৃতি

ইসলামি সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি শব্দদ্বয় শুনতে কাছাকাছি মনে হলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান—

- **ইসলামি সংস্কৃতি**: এটি হলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের মাঝে দেশ ও অঞ্চল নির্বিশেষে যেসব বিষয় অভিন্ন তার সমষ্টি। এই সংস্কৃতি ইসলামের মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন, মুসলিম নারীদের পোশাকের রং বা নকশা ভিন্ন হলেও, এর অভিন্ন এবং মৌলিক নীতি হলো পর্দাব্যবস্থা। এই নীতি স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সকল মুসলিম সমাজে একই রূপে পালিত হয় (ইসলাম ধর্ম: সমাজ :সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১০৬)।
- **মুসলিম সংস্কৃতি:** এটি হলো দেশ ও অঞ্চলভেদে মুসলিম সমাজের মধ্যে যেসব আচার-প্রথা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, তার প্রকাশ। এই রূপভেদ মূলত স্থানীয় ঐতিহ্য, আবহাওয়া বা জনমিতির প্রভাবে সৃষ্টি হয়।যেমন— মাথা ঢাকার ক্ষেত্রে তুরস্কের নারীরা যে স্টাইলে হিজাব বা স্কার্ফ পরেন, ইন্দোনেশিয়ার নারীরা তা থেকে ভিন্নভাবে পরতে পারেন।

ইসলামি সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তিপ্রস্তর

ইসলামি সংস্কৃতির যাবতীয় শিক্ষা দুটি প্রধান ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত:

১. ইসলামের পাঁচটি রুকন (Five Pillars): এগুলি হলো ইসলামের কার্যগত দিক এবং মুসলিম হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্যপালনীয় কাজ

- **শাহাদাহ** (সাক্ষ্য): এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো প্রকৃত ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রাসূল।
- **সালাত** : দৈনিক পাঁচবার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামাজ কায়েম করা।
- **যাকাত**: নির্ধারিত সম্পদ থেকে অভাবীদের জন্য যাকাত আদায় করা।
- **সাওম** : রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা।
- **হজ** : সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ পৌঁছার উদ্দেশ্যে হজ পালন করা।

২. ঈমানের ছয়টি মূলনীতি : এগুলি হলো ইসলামি আকীদার মৌলিক বিশ্বাস, যা প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়—

- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
- তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস
- তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস
- তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

- আখিরাতের (পরকালের) প্রতি বিশ্বাস
- তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।(সভ্যতার সংকট, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৮০)

এই ভিত্তিপ্রস্তরগুলি ইসলামি সংস্কৃতিকে একটি শক্তিশালী, সুসংহত এবং ঐশী নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড সবকিছুর ওপরই তার প্রভাব বিস্তার করে।

ইবরাহীমি সভ্যতার ধারাবাহিকতায় ইসলামি সংস্কৃতি: একটি ঐশী জীবনব্যবস্থা

ইসলামি সংস্কৃতি কোনো জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়, বরং এটি সঠিক অর্থে একটি **ঐশী সংস্কৃতি** । আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামি সভ্যতাকে **রব্বানী তথা ঐশী সভ্যতা** বলা হয়, যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং একে বিশ্বজনীন রূপ দেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (ইসলাম ধর্ম: সমাজ :সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১০৬)

ইসলামি সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা ও লক্ষ্য

ইসলামি সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মতো। এখানে মহান আল্লাহর মর্যাদা অন্যান্য ধর্মের যেকোনো সাধারণ উপাস্যের সমপর্যায়ের নয়; বরং তিনি হলেন সর্বোচ্চ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র সত্তা, যাঁর নির্দেশ–বিধানই পুরো ব্যবস্থার ভিত্তি। রাসূল ﷺ তাঁর প্রতিনিধি এবং কুরআন আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ। এই সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে মহাসাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা, যা দুনিয়াবি জীবনে মানুষের আমলের ওপর নির্ভরশীল।

এই সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা এবং শক্তিশালী বন্ধন। যার সাহায্যেই এ সংস্কৃতি স্বীয় অনুসারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে। এটি তার অনুসারীদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মসংযম, বদান্যতা, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট গুণরাজির সৃষ্টি করে, যাতে করে একটি সৎ ও পবিত্র জনসমাজ গড়ে উঠতে পারে।

ইবরাহীমি সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ইবরাহীমি সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য তিনটি যা ইসলামি সভ্যতাকে অনন্যতা দান করেছে—

ক. আল্লাহর সত্তায় নিশ্চিত বিশ্বাস ও সার্বক্ষণিক স্মরণ

এই সভ্যতার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় (ইয়াকীন) পোষণ করা এবং অব্যাহত ও সার্বক্ষণিকভাবে তাঁকে হাযির-নাজির জ্ঞান করা। আল্লাহর নাম

এবং তাঁর যিকর মুসলিম সমাজ ও সভ্যতার প্রতিটি শিরা-উপশিরার ভেতর রক্তের ন্যায় অব্যাহতভাবে সঞ্চালিত।

জন্মলগ্নে শিশুর কানে আযান দেওয়া থেকে শুরু করে, বিয়েতে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ, কিংবা জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর পবিত্র নামের তালকীন করা—সবকিছুতেই আল্লাহর স্মরণ বিদ্যমান। দৈনন্দিন জীবনে হাঁচি এলেও আল্লাহর নাম নিতে বলা, 'মাশাআল্লাহ', 'ইন্শা-আল্লাহ' বলা এই সার্বক্ষণিক উপস্থিতির অনুভূতিকেই তুলে ধরে।

খ. আকীদা-ই তাওহিদ (একত্ববাদ) এর প্রাধান্য

মুসলিম সভ্যতার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতীক হলো আকীদা-ই তাওহিদ, যা মানুষের আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে আমল তথা কর্মের জগৎ পর্যন্ত সর্বত্র উজ্জ্বল।এর উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা যায়—

- **মূর্তিপূজা বর্জন:** বসতবাটি বা চিত্রশালাও ইসলামের মূলনীতি মুতাবিক মূর্তিপূজা ও শিরকী প্রতীক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। প্রাণীর ছবি, ভাস্কর্য ও মূর্তি তাদের জন্য নাজায়েয।
- **সীমা সংরক্ষণ:** ইসলামি সভ্যতা কেবল আল্লাহর সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয় এবং তাঁর আইন বিধানকে মানা বা না মানার অধিকারকে নিজের জন্যে সুরক্ষিত রাখে না। যারা আল্লাহর সর্বোচ্চ ক্ষমতার সামনে মাথানত করতে প্রস্তুত, কেবল তাদেরকেই এই দ্বীনের অনুসারী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

গ. মানবীয় মর্যাদা ও সাম্যের ধারণা

ইসলামি সভ্যতার তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতীক চিহ্ন হলো মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এবং মানবীয় সাম্যের আকীদা ও বিশ্বাস—

- **সামাজিক সাম্য:** মুসলিম মন-মানস স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ছুৎ-অচ্ছুৎ-এর আচার-আচরণ ও প্রথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অজ্ঞ। প্রজা ও রাজা একই কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাত আদায় করে। ইমাম একজন সাধারণ মানের লোক হলেও বড় বড় বংশের, অভিজাত খান্দানের লোক তার পেছনে নামাজ পড়তে বাধ্য।
- **পেশাগত মর্যাদা:** ইসলামে কোনো পেশাকেই ঘৃণ্য বা অবজ্ঞেয় মনে করা হয় না। অনেক সম্মানিত আলেমের নামের সঙ্গেও তাঁদের পূর্বপুরুষের পেশাগত পদবী যুক্ত রয়েছে (যেমন: হাল্লাক, যায়্যাত, কাসসাব), যা তাঁরা লজ্জা ও অপমানের বলে মনে করেন না।
- **বিধবা বিবাহ:** বিধবা বিবাহকে শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বা প্রচলিত নিয়মের মধ্যে কখনো দূষণীয় ও আপত্তিযোগ্য কাজ বলে মনে করা হয়নি, বরং এটি নবীর সুন্নত এবং উত্তম কাজ হিসেবে উৎসাহিত করা হয়েছে ।

জ্ঞানচর্চা ও শিল্পকলা

ইসলামে জ্ঞানের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত সুউচ্চ। মক্কার হেরা পর্বত গুহায় সর্বপ্রথম যে ওয়াহী নাযিল হয়েছিল, তার প্রথম শব্দটিই ছিল **"ইক্বরা" (পড়ুন)**। এটি জ্ঞানের গুরুত্বকে সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটি ছিল এক বিপ্লবাত্মক আহ্বান যে, জ্ঞানার্জনের যাত্রাটি মহান রবের (প্রতিপালকের) নামেই শুরু করা উচিত, কারণ ইলম তথা জ্ঞান তাঁরই প্রদত্ত, তাঁরই দেওয়া, তাঁরই সৃষ্টি। এই প্রত্যয়বাদই দুনিয়ায় প্রকৃত উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে।

পাশাপাশি শিল্পকলা সম্পর্কে ইসলামি সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তববাদী, সতর্ক ও ভারসাম্যময়। ইসলাম পবিত্র সৌন্দর্যকে মূল্য দেয়, কিন্তু নৃত্য, চিত্রকলা, (জীবন্ত প্রাণীর) মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণের মতো ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। কারণ এদের মধ্যে গভীর নিবিষ্টতা ইসলামের মূল লক্ষ্য, ইমান এবং আল্লাহভীতি ও পরকালীন চিন্তার জন্য ক্ষতিকর।

ইসলামি সংস্কৃতি: মানবজীবনের তত্ত্বাবধায়ক ও পথনির্দেশক

ইসলামি সংস্কৃতি কেবল চলমান জীবনের সঙ্গী হয় না, বরং এটি জীবনের তত্ত্বাবধানও করে। ধর্ম কেবল পরিবর্তনকে এক বাস্তব সত্য হিসেবে মেনে নেয় না, বরং এর দায়িত্ব এও যে, সে পার্থক্য করবে কোনটি সুস্থ পরিবর্তন আর কোনটি অসুস্থ, কোনটি ধ্বংসাত্মক আর কোনটি গঠনমূলক। ধর্ম জীবনের শিক্ষক যেমন তেমনি অভিভাবকও। একজন অভিভাবকের কাজ কেবল ভুল প্রবণতা চিহ্নিত করা নয়, বরং ভুল প্রবণতাকে বাধা দেওয়াকেও আপন কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞান করে। ধর্ম এমন কোনো সিস্টেম নয় যে, কোনো দলীল কিংবা দস্তাবেয আসলেই তার ওপর সিলমোহর মেরে দেবে, বরং যেটাকে সে মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর মনে করে, সে এর প্রতিবন্ধক হবে।

ইসলামি সভ্যতাই সুসভ্যতা

ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি আপন প্রাণসত্তা ও উপাদানের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপেই মৌলিক এবং এর ওপর কোনো অনৈসলামিক সংস্কৃতির অণুমাত্রও প্রভাব নেই । এই সংস্কৃতি তার অনুসারীদের মধ্যে নৈতিকতা ও সচ্চরিত্র সৃষ্টি করে এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়, যা সঠিক অর্থে মানবিক সংস্কৃতি। সাইয়িদ কুতুবের মতে, ইসলামি সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা যা মানুষকে সত্যিকারের মুক্তি ও মর্যাদা দিতে সক্ষম। উচ্চতর নৈতিক মানদণ্ডই ইসলামি সভ্যতাকে সুসভ্যতার স্তরে উন্নীত করেছে। এই সভ্যতা মানুষকে ভোগবাদের সংকীর্ণ চক্র ভেঙে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য—মৃত্যু—এবং আখিরাতের (পরকালীন) জীবনের প্রতি মনোনিবেশ করতে শেখায়। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মানবজাতিকে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয়

জীবনে কল্যাণ ও মুক্তি দান করা, যার মাধ্যমে এটি জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং লক্ষ্যভিত্তিক করে তোলে।

তৃতীয় অধ্যায় - মুসলিম জীবনের স্বরূপ: ইসলামি সমাজ ও সামাজিকতা

ইসলামি সমাজের ধারণা

ইসলামি সমাজ হলো শারীয়াহ ও তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি নৈতিক ও সুশৃঙ্খল মানব ব্যবস্থা, যেখানে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ই সুসংজ্ঞায়িত। ইসলামি শারীয়াহ একজন মুসলিমের জীবনকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে রেখেছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো একটি স্বতন্ত্র মিল্লাত এবং উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে নিজেদের পরিচিতি এবং আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য বজায় রাখা।

ইসলামি সমাজ ও সামাজিকতা

জীবন-যাপনের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহর আইন ও নির্দেশনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা একটি ইসলামি সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য—

১. শিশুর জন্ম থেকে সাবালকত্ব লাভ: ভিত্তি স্থাপন

শিশুর জন্ম একটি পবিত্র ঘটনা, যা ইসলামি সমাজে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক রীতির মাধ্যমে শুরু হয়।

ক. আযান ও ইকামত

নবজাতকের আগমনের পর প্রথম কাজটি হলো তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত দেওয়া। এর মাধ্যমে বিশ্বের প্রথম শব্দ হিসেবে শিশুর কানে আল্লাহর নাম, তাঁর একত্ববাদ (তাওহীদ) এবং ইবাদতের আহ্বান পৌঁছানো হয়। এটি একটি প্রতীকী বার্তা যে, এই শিশুটির জীবনযাত্রা শুরু হলো আল্লাহর নাম দিয়ে।

খ. তাহনীক করা

কোনো বুযুর্গ বা নেককার ব্যক্তি দ্বারা চিবানো খেজুর বা মিষ্টি শিশুর মুখে দেওয়া সুন্নাত। এটি বরকত ও সৌভাগ্যের প্রতীক।

গ. আকীকা ও নামকরণ

জন্মের সপ্তম দিনে শিশুর আকীকা করা মুস্তাহাব (উত্তম)। ছেলে সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল যবেহ করা হয়। এই গোশত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এটি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মাধ্যম। হাদীসে এসেছে —

"*প্রতিটি শিশু তার আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথার চুল কামানো হবে।*" (সুনান আত-তিরমিযী: ১৫২২)।

নাম রাখার সময় সুন্দর ইসলামি অর্থবোধক নাম রাখতে বলা হয়েছে, যাতে সন্তানের মুসলিম পরিচিতি প্রকাশ পায়।

এক্ষেত্রে কুরআনের দিকনির্দেশনা হলো সর্বোত্তম নাম সেগুলো, যা আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে। তাই—

- 'আব্দ' (বান্দা) শব্দ সহযোগে নাম রাখা যেতে পারে, যেমন: আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ইত্যাদি।

রাসূল ﷺ বলেছেন -

"*তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হলো— আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।*" (সহীহ মুসলিম: ২১৩২)।

- বরকত ও সম্মানের প্রতীক হিসেবে আম্বিয়া (নবী-রাসূল) এবং সাহাবায়ে কিরামের নামে নাম রাখা যেতে পারে, যেমন: ইব্রাহীম, ইউসুফ, মরিয়ম ইত্যাদি।
- নামের দ্বারা যেন শির্ক, অহংকার বা অবাধ্যতা প্রকাশ না পায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে বলা হয়েছে (যেমন: মালিকুল-মুলক)।

ঘ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

- **পাকপবিত্রতা**

শিশু বোঝার বয়সে পৌঁছালে তাকে পাক-পবিত্রতার তা'লীম দেওয়া হয়। শরীর, পোশাক ও পরিবেশকে নাপাকি থেকে মুক্ত রাখার শিক্ষা দেওয়া হয়।

- **সালাতের নির্দেশ:** শিশু যখন সাত বছরের হয়, তখন তাকে সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়। দশ বছর বয়সে উপনীত হলে সালাত আদায়ের জন্য জোরালো তাগিদ ও সতর্ক করা হয়। এর মাধ্যমে তারা জামাতের সঙ্গে মসজিদে যাওয়ার এবং ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার শিক্ষা পায়।

হাদিসে এসেছে—

"*তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়স হলে তাদের সালাতের নির্দেশ দাও, আর দশ বছর বয়স হলে সালাতের জন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।*" (সুনান আবূ দাউদ: ৪৯৫)।

- **ইসলামি আদব-কায়দা:** ডান হাত দিয়ে খাওয়া-পান করা ও মোসাফাহা করা, বাম হাত দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা, বসে পানি পান করা, হাঁচি এলে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা— এই ধরনের মৌলিক ইসলামী আদব-কায়দা শেখানো হয়। ছোট ছোট সূরা ও দু'আ মুখস্থ করানো হয়, যা তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে।

ঙ. সাবালকত্ব লাভ (তাকলিফ)

ইসলামে বালেগ হওয়া (সাবালকত্ব লাভ) মানে একজন ব্যক্তি ইসলামের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করার যোগ্যতা অর্জন করা।ছেলে বা মেয়েতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা দিলে সে বালেগ বলে গণ্য হয়:

বালক (ছেলে): বয়ঃসন্ধির প্রথম চিহ্ন, শুক্রাণু উৎপাদন বা প্রাপ্তবয়স্ক শারীরিক বৈশিষ্ট্য।

বালিকা (মেয়ে): প্রথম মাসিক বা প্রাপ্তবয়স্ক শারীরিক বৈশিষ্ট্য।

এই সময় থেকে তার ওপর ইসলামি শারীয়াহর সকল বিধান (ফরয, ওয়াজিব) আরোপিত হয়। সে হালাল-হারাম, পাপ-পুণ্য এবং শাস্তির বিধানের অধীন হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কাজের জন্য জবাবদিহির উপযুক্ত হয়।

২. দাম্পত্য জীবন: শান্তি ও নিরাপত্তা

ইসলামে বিবাহকে কেবল জীবনের প্রয়োজন নয়, বরং এটিকে একটি ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়, যা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পথ সুগম করে।

ক. বিবাহের মৌলিক শর্ত ও তরীকা

ইসলামী বিবাহ হলো সংক্ষিপ্ত, সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর একটি চুক্তি। আল্লাহ তা'আলা বিবাহের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।

কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ۝

—" *আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে হলো এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"* (সূরা রূম, ৩০:২১)

অপরিহার্য বিষয়

- বিবাহের জন্য ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) এবং দু'জন সাক্ষী থাকা জরুরি।
- **দেনমোহর (মাহর)**

পুরুষের জন্য স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান এবং তার খোরপোষের যিম্মাদারী গ্রহণ করা ফরয।

- **বিবাহের খুতবা ও দায়িত্ববোধ**

বিয়ে পড়ানোর সময় কুরআন শরীফের আয়াত ও হাদীস সম্বলিত খুতবা পাঠ করা হয়। এই খুতবাটি বর ও কনের উপর অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়। খুতবায় বিশেষত এই আয়াতটি পাঠ করা হয়—

—"*হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার সঙ্গীনি সৃষ্টি করেছেন...*" (সূরা নিসা, ৪:১)

এটি নবদম্পতিকে এই নতুন সম্পর্ক স্থাপনের পরও আল্লাহকে ভয় করতে এবং আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাকতে নির্দেশ করে।

খ. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব শুধু আর্থিক নয়, বরং মানসিক ও আধ্যাত্মিকও।

১. আর্থিক নিরাপত্তা ও ভরণপোষণ

- **বাসস্থান:** স্ত্রীকে তার সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী নিরাপদ ও আরামদায়ক বাসস্থান প্রদান করা।
- **খাদ্য ও বস্ত্র:** স্ত্রীর জন্য পর্যাপ্ত ও মানসম্মত খাদ্য, বস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা।

২. দাম্পত্য জীবনে উত্তম আচরণ

দাম্পত্য জীবনে উত্তম আচরণ ইসলামি শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের জন্য পারিবারিক জীবন ও স্ত্রীর প্রতি সদাচরণের সর্বোচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন।

- **সম্মান ও স্নেহ:** স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাকে ভালোবাসা ও স্নেহ দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خِيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

—"*তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের (স্ত্রীর) কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।*"

(সুনান আত-তিরমিযী: ১১৬২)

- **মানসিক স্বস্তি:** স্ত্রীর আবেগ ও অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তাকে মানসিক নিরাপত্তা প্রদান করা।
- **বিশ্বস্ততা বজায় রাখা:** আচরণ, সম্পর্ক ও ইচ্ছায় পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা।
- **ধৈর্যশীলতা:** স্ত্রীর কোনো ত্রুটি বা ভুল হলে ধৈর্য ধারণ করা, কারণ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত মানুষ পাওয়া অসম্ভব।
- **ধর্মীয় নির্দেশনা:** স্বামী তার স্ত্রীকে ইসলামি জ্ঞান শিক্ষা দিতে সাহায্য করবে এবং নেক কাজ করতে উৎসাহিত করবে

গ. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

ইসলামী পরিবার ব্যবস্থায় স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক পারস্পরিক দায়িত্ব, সদাচরণ এবং ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যগুলো মূলত —নৈতিক, পারিবারিক, ও ধর্মীয় স্তরে বিভক্ত।

১. নৈতিক দায়িত্ব

- **আদব ও সম্মান প্রদর্শন**: স্বামীর সম্মান রক্ষা ও তার সঙ্গে সদাচরণ করা ইসলামী নৈতিকতার একটি মৌলিক অংশ।
- **বিবেকশীল আচরণ:** সম্পর্কের শান্তি বজায় রাখা, তর্ক-বিতর্কে সংযম রাখা, এবং গৃহশান্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

২. পারিবারিক দায়িত্ব

- **গৃহসংসার পরিচালনায় সহযোগিতা**: পরিবার এবং গৃহের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে সুসংগঠিত রাখা।
- **সম্পদের হেফাজত**: স্বামী অনুপস্থিত থাকলে তার সম্পদ ও পরিবারিক স্বার্থ রক্ষা করা।
- **সন্তানদের সঠিক তারবিয়তে অংশগ্রহণ**: ইসলামী আদর্শে সন্তানকে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

৩. ধর্মীয় দায়িত্ব

- **আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা:** স্বামীর প্রতি কর্তব্যগুলো আল্লাহর বিধানভুক্ত হওয়ায় এগুলো পালন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।
- **স্বামীর বৈধ নির্দেশ পালন**: কোনো হারাম বিষয় ছাড়া স্বামীর নির্দেশ পালন করা।
- **বিশ্বস্ততা বজায় রাখা:**আচরণ, সম্পর্ক ও ইচ্ছায় পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা।

৩. জীবনের শেষ পর্যায়: রোগ ও মৃত্যু

জীবনের অনিবার্য সত্য হলো রোগ-শোক এবং শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু।

ক. রোগ ও ইবাদত

রোগের সময়ও ইবাদাত বন্ধ করা যাবে না, তবে ইসলামি শারীয়াহ সহজ পন্থা অনুমোদন করেছে—

- **সালাত**

দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারলে বসে, বসে না পারলে শুয়ে, এবং শুয়ে না পারলে ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও সালাত আদায় করতে হবে।

- **তায়াম্মুম**

যদি পানির ব্যবহার রোগীর জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের অনুমতি রয়েছে।

খ. রোগী পরিদর্শন

রোগী পরিদর্শন করা বিরাট সাওয়াবের কাজ। তবে রোগীর কাছে বেশিক্ষণ অবস্থান না করে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে দ্রুত বিদায় নেওয়া উচিত, যাতে রোগীর কষ্ট না হয়।

গ. মৃত্যুর মুহূর্ত ও তালকীন

একজন মুসলিম চায় তার শেষ নিঃশ্বাসটি যেন ঈমানের সাথে হয়। এই কারণে—

- **কালিমার তালকীন**

মৃত্যুশয্যায় থাকা ব্যক্তিকে উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনরা কালিমায়ে শাহাদত (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) বা শুধু আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তালকীন দিতে থাকেন।

- **সূরা ইয়াসীন**

এ সময় সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা খুবই উপকারী।

ঘ. কাফন, জানাযা ও দাফন

- **গোসল ও কাফন**

ইন্তিকালের পর দ্রুত মৃতকে গোসল দেওয়া হয় এবং নতুন, পাক-পবিত্র ও সাদা কাপড়ে কাফন পরানো হয়।

- **জানাযার সালাত**

জানাযার সালাতে শরিক হওয়া বিরাট সাওয়াবের কাজ। এটি রুকু-সিজদা ছাড়া জামাত সহকারে চার তাকবীরের মাধ্যমে আদায় করা হয়, যা মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ ও সুপারিশের সালাত।

- **কবরস্থ করা**

জানাযার খাটিয়া কাঁধে করে কবরস্থানে নেওয়া হয়। কবরে মৃতকে কেবলামুখী করে শুইয়ে দেওয়া হয়। মাটি দেওয়ার সময় উপস্থিতদের মুখে এই আয়াতটি থাকে:

وَمِنَ الْأَرْضِ خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

— "*আমি তোমাদেরকে এই মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছিলাম আর এর ভেতর তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং এর থেকেই তোমাদেরকে আর একবার বের করে আনব।*" (সূরা ত্বাহা, ২০:৫৫)

ঙ. শোকাহত পরিবারের প্রতি সহযোগিতা

মৃতের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে খাবার প্রেরণ করা সুন্নাত, যাতে শোকাহত পরিবারকে রান্না-বান্নার কষ্ট থেকে মুক্ত রাখা যায়।

এই সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে, যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর প্রতি অনুগত ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল থাকতে পারে।

মুসলিম সমাজে সামাজিক দায়িত্ব: জীবনের সর্বস্তরে

ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতই নয়, বরং সামাজিক দায়িত্ব, নৈতিক আচরণ এবং সম্পর্কের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ শেখায়। একজন মুসলিমের জীবনব্যাপী দায়িত্ব কেবল নিজের প্রতি নয়, বরং পরিবার, প্রতিবেশী, সম্প্রদায় এবং এমনকি অমুসলিমদের প্রতিও বিস্তৃত।

১. পারিবারিক দায়িত্ব

পরিবার হল সমাজের মূল ভিত্তি। ইসলামে পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ইবাদতের অংশ।

- **পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব**

পিতামাতার প্রতি দায়িত্বের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে যেমন জোর দেওয়া হয়েছে, তেমনি অসংখ্য হাদীসেও এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সন্তানের প্রধান দায়িত্ব হলো পিতামাতার প্রতি সম্মান, স্নেহ ও যত্ন প্রদর্শন। কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

— "আর তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তুমি তাদের প্রতি 'উহ্' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করো না এবং তাদের ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।" (সূরা বনী ইসরাঈল:২৩)

- **দাম্পত্য সঙ্গী ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব**

স্বামী–স্ত্রী পারিবারিক জীবনে একে অপরের পরিপূরক; তাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আছে পারস্পরিক দায়িত্ব, সম্মান ও ন্যায়বোধের ভিত্তিতে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ, ন্যায্যতা ও আর্থিক দায়িত্ব পালন করে, আর স্ত্রী স্বামীর প্রতি সম্মান, বিশ্বস্ততা ও গৃহ-সংগঠনে সহযোগিতা করে। উভয়েই মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে একে অপরকে সহায়তা করে পরিবারে শান্তি বজায় রাখে (পূর্ব আলোচনা দ্রষ্টব্য)। একই সঙ্গে সন্তানদের সৎ চরিত্র, ধর্মীয় শিক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশে লালন–পালন তাদের যৌথ দায়িত্ব। এভাবেই পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ইসলামী পরিবারকে শক্ত ভিত্তি প্রদান করে।

- **ভাই–বোনের প্রতি দায়িত্ব**

ইসলামের শিক্ষা হলো ভাইবোন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও সহযোগিতা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনের সময় একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো। একই সঙ্গে উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির বিষয়ে ন্যায়, স্বচ্ছতা ও ইসলামি বিধান মেনে চলা আবশ্যক।

২. আত্মীয় ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব

মুসলিমদের জন্য আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশী ও সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব অপরিহার্য।

- **আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা**

ইসলামে আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে বলা হয়েছে,

—"*আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করো।" (সূরা নিসা, ৪:৩৬)*

- **প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব**

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা, দুঃখে সহায়তা, আনন্দে অংশগ্রহণ এবং সংঘাত এড়িয়ে শান্তি বজায় রাখা ইসলামি সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

—"জিবরাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত বেশি উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, আমার ধারণা হয়েছিল, আল্লাহ হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ করে দেবেন।" (সহীহ বুখারী: ৬০১৪, সহীহ মুসলিম: ২৬২৪)।

৩. অমুসলিমদের সঙ্গে আচরণ

সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে অমুসলিমদের প্রতি সদাচরণও অন্তর্ভুক্ত।

- **সততা ও ন্যায়পরায়ণতা**

ব্যবসা বা দৈনন্দিন জীবনযাপনে অমুসলিমদের প্রতি সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা আবশ্যক।

- **সম্মান ও সহযোগিতা**

অমুসলিম বন্ধু, সহকর্মী বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৌজন্য বজায় রাখা এবং মানবিক প্রয়োজনে সহযোগিতা ও মানবিক সহমর্মিতা প্রদর্শন করা ইসলামী শিক্ষার অংশ।

কুরআনে বলা হয়েছে-

"দ্বীন (ধর্ম) সম্পর্কে যারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচারণ করতে ও তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।" (সূরা মুমতাহিনা, ৬০:৮)

৪. সামাজিক শিক্ষা ও অবদান

- **ভ্রাতৃত্ববোধ**

হাদীসে আছে-

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

—"এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তাকে নির্যাতন করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না।" (সহীহ মুসলিম: ২৫৬৪)।

- এছাড়াও—

শিশু বয়স থেকেই মুসলিম সমাজে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা হয়, যার মধ্যে রয়েছে সততা, সৎ কাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজে বাধা, সহমর্মিতা, অন্যের অধিকার রক্ষা এবং দরিদ্রদের সাহায্য, পরিবেশ সংরক্ষণসহ উম্মাহর কল্যাণে অংশগ্রহণ।

বলা হয়েছে-

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

— *"দীন হলো কল্যাণকামিতা।"* (সহীহ মুসলিম: ৫৫)

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী সমাজ হলো ঐশী জ্ঞানভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক ও দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেয়।

পরিবার, আত্মীয় এবং প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করে সমাজে ইনসাফ,আদল এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। সহজকথায়, ইসলামি জীবনধারায় একজন মুসলিমের সমগ্র জীবনটাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ ইবাদত, যার লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মহাসাফল্য অর্জন।

চতুর্থ অধ্যায় - ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

পটভূমি

গোটা বিশ্বজুড়ে আমরা আজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসন দেখতে পাই। এই সংস্কৃতির বিস্তার প্রথমে ইউরোপীয়ান ঔপনিবেশিক শাসনামলে এবং বর্তমানে নব্য সাম্রাজ্যবাদের যুগেও তা পরোক্ষ শাসনব্যবস্থা হিসেবে টিকে আছে। মিডিয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাবে বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা সংস্কৃতি ব্যাপক প্রসার লাভ করে, যার প্রভাব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সকল দেশেই প্রবল।

এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের চিত্র এতটাই সুস্পষ্ট যে, এটি কোনো আশ্চর্যের বিষয় থাকে না যখন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে নেংটি পড়া দক্ষিণ অ্যামেরিকান কোনো উপজাতি তরুণকে অ্যামাজনের গহীন জঙ্গলে মাথায় নাইকি'র লোগো সম্বলিত বেসবল ক্যাপ পরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

মূলত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সংঘাত একটি অনিবার্য স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য সবখানেই সংস্কৃতি এমন একটি বিষয় যা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের আলোচ্য সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনদর্শন—

১. ইসলামি আদর্শিক ভিত্তি

তাওহিদ-ভিত্তিক ইসলামি ব্যবস্থা, যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব (হাকিমিয়াহ) প্রতিষ্ঠা করে।

২. পাশ্চাত্য আদর্শিক ভিত্তি

সেক্যুলার পাশ্চাত্য ব্যবস্থা, যা জীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষের (মানবতা, পার্লামেন্ট বা মতবাদ) সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

যার ফলস্বরূপ নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কাঠামো তৈরি হয়েছে।

হান্টিংটনের থিসিস: ইসলাম কেন পশ্চিমাদের কাছে মূল সমস্যা?

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন সভ্যতার এই সংঘাতকে একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ইসলামি মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যা নয়; বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে স্বয়ং ইসলামই তাদের মূল সমস্যা। তাঁর এই বিশ্লেষণের পেছনে তিনি উভয় পক্ষের দুটি মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন:

১. মুসলিমদের মধ্যেকার দুটি দ্বন্দ্ব-সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক হান্টিংটন মুসলিমদের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন, যা এই দ্বন্দ্বের অন্যতম চালিকাশক্তি—

ক. সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বে গভীর বিশ্বাস

মুসলিমরা নিজেদের সংস্কৃতিকে অন্য যেকোনো সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠতর গণ্য করে। অধিকাংশ মুসলিম গর্বভরে দাবি করে যে, তাদের ধর্ম ইসলাম অন্য যেকোনো ধর্ম বা দর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ। এই আত্মবিশ্বাসী মনোভাবের জন্ম হয়েছে এই বিশ্বাসের স্বাভাবিক দাবি হিসেবে যে, "ইসলামি জীবনব্যবস্থা বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ"। আর এটা মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে, আল্লাহর প্রেরিত ধর্মের অনুশীলন যে সংস্কৃতির জন্ম দেয় তা নিশ্চিতভাবে মানুষের গবেষণা, আন্দাজ-অনুমান থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতি থেকে উৎকৃষ্ট হবে।

খ. ইসলামি আইন (শারীয়াহ্‌) বাস্তবায়নের প্রবল আকাঙ্ক্ষা

মুসলিমদের মনে তাদের দেশে ইসলামি আইন বা শারী'আহ্‌ বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। ইউরোপীয়ান ঔপনিবেশিক যুগে মুসলিম দেশগুলোর শারী'আহ্‌ ভিত্তিক আইনব্যবস্থাকে ইউরোপীয়ান আইনকাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। বর্তমানে নব্য সাম্রাজ্যবাদের এই যুগেও পশ্চিমা প্রভুদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিছু মুসলিম দাবিদারদের হাতেই শাসন-কর্তৃত্বের লাগাম উঠেছে এবং তারাও সেই ইউরোপীয়ান আইন অনুসারে মুসলিম দেশগুলো শাসন করে চলছে। বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিম দেশের সরকার ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ডাচ আইন দ্বারা দেশ শাসন করছে, আর ইসলামি আইনগুলোকে কেবল পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। এর ফলস্বরূপ, আলজেরিয়া, সিরিয়া, মালি, চেচেনিয়া, তিউনিসিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যে অস্থিতিশীলতা, আফগানিস্তানে ইমারত প্রতিষ্ঠা —তা এই ইসলামি পুনর্জাগরণের ঢেউ এবং স্বাধীন শাসনব্যবস্থার দাবিরই বহিঃপ্রকাশ।

২. পশ্চিমা শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ও সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা

একইভাবে, হান্টিংটন স্পষ্ট করেন যে, মুসলিমদের জন্যেও CIA কিংবা অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সত্যিকার সমস্যা নয়, বরং পুরো পশ্চিমা সভ্যতাই তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। তিনি সিআইএ বা আমেরিকান সেনাবাহিনীকে শত্রু হিসেবে নাকচ করে বলেন যে, সমস্যার মূল কারণ হলো:

"পশ্চিমারা বিশ্বাস করে যে, তাদের জীবনধারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বজনীন। এমনকি তারা এ-ও বিশ্বাস করে যে, শক্তি প্রয়োগ করে হলেও গোটা পৃথিবীর মানুষদেরা তা মেনে নিতে বাধ্য করা উচিত। ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্বের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পেছনে এটাই হলো মূল কারণ।" (দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস, পৃষ্ঠা ২১৭-১৮)

পশ্চিমা সভ্যতার আদর্শিক ভিত্তি: পৌত্তলিকতা থেকে সেক্যুলার ডারউইনিজম

বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার শিকড় সন্ধানে বের হলে তার দুটি প্রধান পরিচয় সামনে আসে— প্রথমত এটি ইহুদি-খ্রিষ্টান সংস্কৃতি ভিত্তিক একটি সভ্যতা এবং দ্বিতীয়ত, এর আদর্শিক কাঠামোটি পৌত্তলিকতা, ডারউইনিজম ও সেক্যুলারিজমের মিশ্রণে তৈরি।

১. পৌত্তলিক উত্তরাধিকার ও ধর্মীয় বিচ্যুতি

পশ্চিমা সভ্যতার মূল কেন্দ্র গ্রিক-রোমান সভ্যতা, যেখানে মূর্তিপূজাই ছিল আনুষ্ঠানিক ধর্ম। তারা মানুষসদৃশ বহু দেবতার (জিউস, পসেইডন, হেরা) উপাসনা করত। এই পৌত্তলিক চেতনা আজও পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়—

- **দিনগুলোর নামকরণ:** ইংরেজি সাপ্তাহিক দিনগুলোর নামকরণ সরাসরি রোমান ও জার্মান পুরাণের দেবতাদের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, Saturday এসেছে রোমান কৃষিদেবতা স্যাটার্ন থেকে, Sunday এসেছে 'সূর্য দিবস' থেকে এবং Thursday এসেছে বজ্রদেবতা থর (Thunor) থেকে।
- **খ্রিস্টান ধর্মে সংমিশ্রণ:** ঈসা (আ.) বনি ইসরাইল জাতির মধ্যে প্রেরিত হলেও, কালক্রমে গ্রিক এবং রোমানদের পৌত্তলিকতা তার শিক্ষার সাথে মিশে এর বিশুদ্ধতা নষ্ট করে ফেলে। রোমান দেবতাদের মতো করে যিশু খ্রিস্টকে 'রক্তমাংসে ঈশ্বর' বা 'মানবদেবতা' বানানো হয়। উপাসনার দিন শনিবারের পরিবর্তে রবিবার নির্ধারণ করা হয়, যা রোমে সূর্য দেবতা 'অ্যাপোলো'কে উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন ছিল। এমনকি ক্রিসমাস ডে (২৫ ডিসেম্বর) গ্রহণ করা হয় রোমানদের **'অজেয় সূর্যের জন্মদিন'** (natalis solis invicti) উৎসবের সাথে সাদৃশ্য রেখে।

২. ডারউইনিজম ও উপযোগবাদের দার্শনিক আধিপত্য

পশ্চিমা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস এবং জীবনধারাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার পেছনে মূল কারণ হলো এর দার্শনিক ভিত্তি।

- **ডারউইনিজম ও বিবর্তনবাদ:** এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবজাতির উৎকর্ষ ঘটে এবং সমাজ একটি ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকে। এই তত্ত্বের **'যোগ্যরাই টিকে থাকে"(Survival for the fittest)** শীর্ষক নীতির ভিত্তিতে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিকে মানবসভ্যতার শীর্ষস্থানটি দেওয়া হয়েছে। এই বস্তুবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে নৈতিকতার উন্নয়ন সম্ভব—এই ধারণাই পশ্চিমা চিন্তাধারার মৌলিক গলদ।
- **উপযোগবাদ (Utilitarianism):** এটি পুঁজিবাদী সমাজের নীতিশাস্ত্রের একটি তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যে আচরণ সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সুখ লাভ করবে, ওটাই মহৎ কাজ। এটি বলে যে, একটি জাতির সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সুখ নিশ্চিত করার জন্যে,

যে-কোনো কাজই বৈধ, এমনকি সেটা ঈশ্বরের বিধানের বাইরে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে কারণেই, তারা নিজেদের সুখের জন্যে অন্য জাতির ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাতেও কার্পণ্য করে না।

৩. ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) ও গণতন্ত্র

আজকের দিনে পশ্চিমা সভ্যতার মূলমন্ত্র হলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো এমন এক সামগ্রিক বিশ্বাস যা সকল প্রকারের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে।

- **ধর্মনিরপেক্ষতার আগ্রাসন**

এ মতবাদ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের কোনো প্রভাব গ্রহণযোগ্য নয়; নাগরিক নীতিমালা প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো প্রভাব থাকতে পারবে না। এই মতবাদ মানুষের মনোবৃত্তি, স্পৃহা এবং চিন্তা-চেতনার ধর্মনিরপেক্ষীকরণ ঘটিয়েছে।

- **গণতন্ত্রের বিসর্জন**

পশ্চিমারা গণতন্ত্রকে বিকিয়ে দিয়ে হলেও ধর্মনিরপেক্ষতাকে যেকোনো মূল্যে ধরে রাখতে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই মনোভাবই গণতান্ত্রিক পশ্চিমা শক্তি কর্তৃক তুরস্ক এবং আলজেরিয়ার অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসনকে সমর্থন যোগানোর নেপথ্য কারণ। মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও, ধর্মনিরপেক্ষতা ধরে রাখা তাদের কাছে গণতন্ত্রের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম ও পাশ্চাত্যের ব্যবহারিক সংঘাত: সার্বভৌমত্ব ও নীতির মৌলিক পার্থক্য

ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত কেবল ধারণাগত নয়, এর ফলস্বরূপ জীবনের তিনটি প্রধান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী কাঠামো তৈরি হয়েছে।

১. নৈতিকতা ও সামাজিক ব্যবস্থা: আপেক্ষিকতা বনাম স্থায়ীত্বের লড়াই

পাশ্চাত্য সভ্যতায় সেক্যুলার-মানবাধিকারের ধারণার ভিত্তিতে নৈতিকতাকে আপেক্ষিক (Relative) হিসেবে দেখা হয়। সামাজিক মূল্যবোধ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে, এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর বিপরীতে, ইসলাম নৈতিকতাকে আল্লাহ্‌র সাথে যুক্ত করে একে স্থায়ী মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

- **নারীবাদ ও পারিবারিক স্থিতি**

পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নারীবাদী আদর্শের চরম প্রকাশ পারিবারিক কাঠামোর মৌলিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করেছে। এখানে নারীর অধিকারকে প্রধান্য দিতে গিয়ে চিরায়ত পারিবারিক দায়িত্ব, শৃঙ্খলা এবং নৈতিক বন্ধন বিঘ্নিত হয়েছে।এর বিপরীতে ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে মজবুত করার মাধ্যমে সামাজিক

নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সুষম অধিকার ও দায়িত্বের সীমারেখা নির্ধারিত।এই বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে—

"*আর স্ত্রীদের জন্য (স্বামীদের উপর) ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেরূপ (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে তাদের উপর। তবে পুরুষদের তাদের উপর একটি মর্যাদা বেশি রয়েছে। আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল-বাকারা :২২৮)*

এই আয়াত নারীর অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবারে শৃঙ্খলারক্ষাকারী হিসেবে পুরুষের দায়িত্বশীলসুলভ দায়িত্বকে চিহ্নিত করে, যা পশ্চিমা নারীবাদী মতবাদের সঙ্গে ধারণাগতভাবে স্বতন্ত্র।

- **সমকামিতা ও নৈতিক মানদণ্ড**

পশ্চিমা আপেক্ষিক নৈতিকতা সমকামিতাকে (Homosexuality) সামাজিক ও আইনি বৈধতা দিয়েছে। ইসলাম এটিকে স্থায়ী নৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এই মৌলিক সংঘাত প্রমাণ করে যে, পশ্চিমা জীবনধারা ও ইসলামি জীবনধারা মৌলিকভাবে বিপরিতধর্মী।

২. রাজনৈতিক কাঠামো ও আমানতের সংঘাত

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বটি সার্বভৌমত্বের উৎস নিয়ে। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে ক্ষমতা দখল, স্বার্থরক্ষা ও ভোট-ভিত্তিক গণতন্ত্রকে বৈধতা দেওয়া হয়। অপরদিকে ইসলাম রাজনীতিকে **'আমানত'** হিসেবে দেখে।

- **নেতৃত্বের জবাবদিহিতা**

ইসলামে নেতৃত্ব জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব । ইসলামি সরকার দুটি স্তরে জবাবদিহি করে— প্রাথমিকভাবে আল্লাহ্র কাছে (পরকালের জবাবদিহিতা) এবং পরবর্তীতে জনগণের কাছে। এই দ্বৈত জবাবদিহিতা শাসনকে আরও ন্যায়ভিত্তিক করে।

- **আইন প্রণয়নে মানুষের ভূমিকা**

আইন রচনায় মানুষের ভূমিকাকে ইসলামি ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয় না, বরং তাকে নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করা হয়। মানুষের এ অধিকার কেবল গৌণ বা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত আইনের মধ্যে থাকবে, মৌলিক বিষয়াদিতে এ অধিকার প্রয়োগ চলবে না।

৩. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: পুঁজিবাদ ও সুদ (রিবা)-এর নিষেধাজ্ঞা

পুঁজিবাদ পশ্চিমা সভ্যতার প্রধান স্তম্ভ, যা সুদের (Interest/Riba) মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। এই ব্যবস্থা সম্পদের কেন্দ্রীকরণ ও ধনী-গরিবের বৈষম্য তীব্র করে।

- **সুদ (রিবা) বর্জন**

ইসলাম এই অর্থনৈতিক মডেলের সাথে সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত, কারণ এটি সুদ (রিবা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। ইসলামে ব্যবসা নৈতিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যেখানে লাভের ঝুঁকি (Risk Sharing) বন্টন বাধ্যতামূলক।

- **সম্পদের সুষম বণ্টন**

যাকাত ও মীরাস (উত্তরাধিকার আইন) ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম সম্পদের পুঞ্জীভূত হওয়া রোধ করে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে সম্পদের একটি ন্যায্য প্রবাহ নিশ্চিত করে, যা পুঁজিবাদী সমাজের বৈষম্যমূলক মডেলের একটি শক্তিশালী বিকল্প।

মুসলিম সমাজে হীনমন্যতা ও অনুকরণের সংকট

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তিতে শীর্ষে উপনীত হওয়ার ফলে মুসলিম সমাজে তৈরি হয়েছে একটি আত্মবিশ্বাসহীনতা ও হীনমন্যতার সংকট ।

পশ্চিমা শক্তির দাপট ও বাহ্যিক চাকচিক্যের সাথে তুলনা করে মুসলিমরা নিজেদের ইসলামি বিশ্বকে দুর্বল মনে করতে শুরু করে। মূলত হীনমন্যতার কারণেই ফিরিঙ্গি সভ্যতার অনুকরণের প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। যেসব মুসলিমরা পশ্চিমাদের অনুসরণ করে, তার পেছনেও এটাই কারণ।

- **পাশ্চাত্যপন্থী নেতৃত্বের ভূমিকা**

পাশ্চাত্য শক্তিগুলো মুসলিম বিশ্বের এই দুর্বলতা কাজে লাগিয়েছে। তারা পাশ্চাত্যপন্থী নেতাদেরকে সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের কৌশল গ্রহণ করেছিল যারা ইসলামের আদর্শিক লক্ষ্যের বিপরীতে ছিল।

- **সমাধান**

এই সংকটের সমাধান হিসেবে মুসলিমদের অবশ্যই তার দ্বীন ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে লজ্জাবোধ করার মানসিকতা ঝেড়ে ফেলা জরুরি। হীনমন্যতা ত্যাগ করে বরং তাদের উচিত ইসলামের স্বকীয়তা নিয়ে বরং গর্ব অনুভব করা।

চূড়ান্ত অনিবার্যতা: সংঘাতের ভবিষ্যৎ ও ইসলামি সমাধান

ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্বের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পেছনে মূল কারণ হলো আদর্শিক সার্বভৌমত্বের সংঘাত। ইসলামি সভ্যতা অত্যন্ত মৌলিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধী। তবে এর অর্থ এই নয় যে, দুটো সভ্যতার মাঝে কোনো মিল নেই; পশ্চিমা সভ্যতার অর্জনের খাতায় এমন অনেক ভালো কিছু আছে যার দ্বারা আজ মুসলিমরা উপকৃত হতে পারে।

কিন্তু ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শিক সংঘাত চলমান এবং এর সমাধান কেবল তখনই সম্ভব, যখন মুসলিম সমাজ তার নিজস্ব আদর্শিক কাঠামোর শক্তি ও পূর্ণাঙ্গতা নিয়ে

আত্মবিশ্বাসী হবে। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী এই বিষয়টির ওপর জোর দেন যে, মুসলিমদের নিজস্ব আদর্শকে পুনর্জীবিত করতে হবে এবং পশ্চিমাদের আরোপিত শর্তে জীবনযাপন করা বন্ধ করতে হবে।

এই সংঘাত মোকাবিলায় মুসলিমদের করণীয় হিসেবে জিহাদ ও ইজতিহাদের চর্চা পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত জরুরি । ইজতিহাদ (স্বাধীন গবেষণা ও সিদ্ধান্ত) নিশ্চিত করে যে, ইসলামের মৌলিক বিধান অপরিবর্তিত থাকলেও, তা আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সময়োপযোগী হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই হলো মানবসভ্যতার আদর্শিক বাঁচা-মরার শর্ত।

পঞ্চম অধ্যায় - উপমহাদেশীয় সমাজ বাস্তবতায় ইসলামি সংস্কৃতি

ভারতীয় উপমহাদেশ তার বিশালতা, প্রাচীন সভ্যতা এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের কারণে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ও চর্চার জন্য এক অনন্য ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সহস্রাব্দ ধরে ইসলামি সংস্কৃতি এই ভূখণ্ডের স্থানীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় দর্শন এবং বিশাল জনসমষ্টির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করেছে, কখনও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, কখনও সংঘাত, আবার কখনওবা গভীর সংমিশ্রণের মাধ্যমে।যার ফলে জন্ম হয়েছে এক জটিল অথচ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বাস্তবতার।
ঔপনিবেশিক শাসনের পতন, উপমহাদেশের বিভাজন এবং পরবর্তীকালে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় এই সাংস্কৃতিক চর্চার গতিপথকে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন করেছে।

প্রাক-ইসলামিক প্রেক্ষাপট

ইসলামের আগমনের সময় উপমহাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। সিন্ধু, বাংলা ও উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ক্ষীণ প্রভাব বিদ্যমান ছিল, যদিও অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধারার অধীনে।এই প্রাক-ইসলামিক প্রেক্ষাপট পরবর্তীতে ইসলামি সংস্কৃতির স্থানীয় রূপটিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে।

হিন্দু সমাজের কঠোর বর্ণপ্রথা এবং সামাজিক বৈষম্যের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের একটি বড় অংশকে এক বিকল্প জীবন পদ্ধতির সন্ধান করতে উদ্বুদ্ধ হয়। ইসলামের সাম্য ও একত্ববাদের বার্তা, যা বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দেয়, তা এই অঞ্চলের নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের কাছে প্রবল আবেদন সৃষ্টি করে।

নব-দীক্ষিত এ মুসলিমদের জীবনযাপনে বহু স্থানীয় প্রথা, লোকবিশ্বাস ও আচার-আচরণ সহজেই বিলীন হয়ে যায়, যার ফলে ভারতবর্ষে মুসলিম সংস্কৃতির একটি সংমিশ্রিত রূপ তৈরি হয়।

উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ও প্রাথমিক বিস্তার

উপমহাদেশে ইসলামের আগমন কোনো একক ঘটনা বা সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে ঘটেনি; এটি ছিল মূলত তিনটি ধারার সম্মিলিত ফল—বাণিজ্য, সুফিবাদের আধ্যাত্মিক প্রভাব এবং সামরিক বিজয়।

ক. বাণিজ্য ও উপকূলীয় রুট

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরব ব্যবসায়ীরা ভারতীয় উপকূল, বিশেষত মালাবার (দক্ষিণ ভারত) ও সিন্ধুতে সক্রিয় ছিল। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই মালাবার উপকূলে ইসলামের বাণী পৌঁছায় এবং স্থানীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইসলামের সহনশীল ও মানবিক দিকগুলির মাধ্যমে স্থানীয়দের আকৃষ্ট করে, যা ছিল ইসলামের আগমনের প্রথম ও এক শান্তিপূর্ণ ধারা।

খ. সুফি ও বুযুর্গদের আধ্যাত্মিক দাওয়াত

উপমহাদেশে ইসলামের ব্যাপক বিস্তারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন আলেম, সুফি ও বুযুর্গগণ। সামরিক বিজয় শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল, কিন্তু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিজয় সম্ভব হয়েছিল সুফি সাধকদের উদার ও সহনশীল মনোভাবের কারণে। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, শাহ জালাল (রহ.) সহ অসংখ্য সুফি সাধক স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষা ব্যবহার করে ইসলামের একেশ্বরবাদী বার্তা প্রচার করেন।

সুফিগণ স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ ও অভাব-অভিযোগের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অনাড়ম্বর জীবন, আধ্যাত্মিক গভীরতা এবং জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা অসংখ্য মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। ফলস্বরূপ, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামের ছায়াতলে এসেছে, যা ছিল রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ইসলামের প্রসারের এক অনন্য উদাহরণ।

গ. সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়

ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় শুরু হয় ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে। এরপর একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদ গজনভীর সামরিক অভিযান এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে কুতুবউদ্দিন আইবেকের দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠা ইসলামের দ্বিতীয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যুগের সূচনা করে। এই বিজয়গুলি ইসলামি শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরবর্তী শতকগুলিতে ইসলামি সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে।

মুসলিম শাসন ও সংস্কৃতির প্রভাব (ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী)

দিল্লি সালতানাত (১২০৬-১৫২৬ খ্রি.) এবং মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রি.) উপমহাদেশে প্রায় ছয় শতাধিক বছর ধরে শাসন করেছে। এই দীর্ঘ সময়কালে ইসলামি সংস্কৃতি কেবল শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম হয়েই থাকেনি, বরং উপমহাদেশের সামগ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এক গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলে।

ক. ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশ

মুসলিম শাসনের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে ভাষা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে।

ফারসি ও উর্দু: দীর্ঘকাল ধরে ফারসি ছিল মুসলিম শাসকদের রাষ্ট্রভাষা, যা স্থানীয় ভাষাগুলোর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে ফারসি শব্দ ও সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রবেশ করে।এর ফলস্বরূপ উর্দু ও হিন্দির মতো নতুন ভাষার জন্ম হয়। এই সময়কালে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চারও ব্যাপক বিকাশ ঘটে।

ফারসি, স্থানীয় ভাষা (বিশেষত খড়ি বোলি) ও সামরিক জীবনধারার সংমিশ্রণে জন্ম নেয়া উর্দু ভাষাই একসময় উপমহাদেশীয় মুসলিম পরিচয়ের এক প্রতীক হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি: মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। মুসলিম শাসকরা স্থানীয় ভাষার পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত গ্রন্থ (যেমন মহাভারত) বাংলায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন এবং বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের বিপুল প্রবেশ ঘটে, যা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

স্থাপত্য: মুসলিম শাসনের অন্যতম প্রধান অবদান স্থাপত্যশিল্পে। মুঘল স্থাপত্য, যেমন তাজমহল, লাল কেল্লা, এবং অসংখ্য মসজিদ ও দুর্গ, পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং ভারতীয় শৈলীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এই স্থাপত্যগুলি ইসলামি নকশা (যেমন জ্যামিতিক বিন্যাস ও ক্যালিগ্রাফি) এবং ভারতীয় মোটিফের সমন্বয়ে একটি নতুন শৈলীর জন্ম দেয়, যা উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে।

খ. প্রশাসনিক, বিচারিক ও শিক্ষাগত কাঠামো

মুসলিম শাসকেরা শারীয়াহভিত্তিক একটি সুসংগঠিত বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, যদিও স্থানীয় প্রথা ও আইনকেও স্থান দেওয়া হয়। তারা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করেন, যা উপমহাদেশের আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করে।

এছাড়াও তারা মাদ্রাসা ও মক্তবের মাধ্যমে একটি সংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, এটি ছিলো এক ধরনের দ্বীনী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি, যা পরবর্তীকালে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং নদওয়াতুল উলামার মতো প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছিলো। মুসলিম রাষ্ট্রের এই শিক্ষাগত কাঠামো বহু মানুষের জন্য ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের সুযোগ তৈরি করেছিল।

সমাজে এই সময়কালে মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জটিল সহাবস্থান তৈরি হয়েছিল, যা **'গঙ্গা-যমুনা তাহজিব'** বা সম্মিলিত সংস্কৃতির জন্ম দেয়।

গ. জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশ ও সাংস্কৃতিক দ্বৈততা

মুসলিম শাসনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে, ইসলামি মূল্যবোধ (যেমন: সাম্য, ন্যায়বিচার, একত্ববাদ) সমাজ জীবনে প্রবেশ করে। তবে এই শাসনকালের একটি গুরুতর দুর্বলতা ছিল নওমুসলিমদের গভীর দ্বীনি শিক্ষা প্রদানে রাষ্ট্রের উদাসীনতা। এর ফলে স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সমাজের অসংখ্য প্রভাব এবং জাহেলী পদ্ধতি রয়ে যায়। এই সংমিশ্রিত ইসলামি সংস্কৃতি বহু শিরক, বিদআত (যেমন পীর পূজা, মাজার পূজা, মহররমের তাজিয়া) দ্বারা দূষিত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দিক থেকেও মুসলিম সমাজে বংশ, গোত্র ও আঞ্চলিক বিদ্বেষের মতো দুর্বলতাগুলি ঢুকেছিল, যা শাসকগোষ্ঠীকে দুর্বল করে দেয়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী উল্লেখ করেছেন, রাজতন্ত্রের যুগে এই অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পতনের প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, যা স্পেনের পতন থেকে শুরু করে দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজত্বের অবসান পর্যন্ত প্রভাব ফেলেছিল।

ঔপনিবেশিক আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক পতন (১৮শ-১৯শ শতাব্দী)

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ছিল মুসলিম শাসনের আনুষ্ঠানিক পতনের শেষ পর্যায় মাত্র। প্রকৃত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পতন শুরু হয়েছিল এরও আগে, ইউরোপীয় বণিকদের ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ ও ক্রমাগত প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে।

ক. বিদেশী বণিকদের প্রভাব ও ক্ষমতার হাতবদল

ষোড়শ শতকের পর থেকে ওলন্দাজ, ফরাসি এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের অজুহাতে উপমহাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। বিশেষ করে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) এবং বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪) জয়ের মাধ্যমে বাংলার দেওয়ানি (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা) লাভ করে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র উপমহাদেশের শাসক শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময়কাল উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য ছিল এক গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের যুগ। তাদের সকল সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

খ. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন

বিদেশী শাসন শুধু রাজনৈতিক ছিল না, এটি ছিল একটি গভীর সাংস্কৃতিক আক্রমণ। লর্ড মেকলের মিনিট (১৮৩৫) ইংরেজ শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য এবং দেশীয় কেরানী তৈরির জন্য এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চাপিয়ে দেয়।যার মূল লক্ষ্য ছিল এমন এক শ্রেণির জন্ম দেওয়া, যারা রক্তে ও চেহারায় ভারতীয় হবে, কিন্তু রুচি, নৈতিকতা ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ। এই শিক্ষা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ছিল ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতিকে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়া, যাতে করে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির মোকাবিলায় মুসলমানরা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে না পারে। এতে করে মুসলিমরা সরকারি চাকরি ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা (মাদ্রাসা) ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে যায়। এই পতন মুসলিমদের মধ্যে এক চরম হীনমন্যতার জন্ম দেয়।

পাশাপাশি এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে এমন একদল লোকও তৈরি করে যারা নিজেদের ঐতিহ্যকে অপমানজনক দৃষ্টিতে দেখা শুরু করে এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে যুগের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম মনে করতে থাকে। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে সম্পূর্ণ ইসলামি প্রভাবমুক্ত মানসিকতায় তারা দেশের শাসন ও অর্থনৈতিক জীবনে কর্তৃত্বপূর্ণ পদে সমাসীন হয়।

ইসলামি সংস্কার ও প্রতিরোধ আন্দোলনসমূহ (১৮শ-১৯শ শতক)

এই গভীর পতন ও সাংস্কৃতিক আক্রমণের মুখে মুসলিম সমাজ দুই ধরনের

প্রতিক্রিয়া দেখায়: একদিকে পাশ্চাত্য অনুকরণের মাধ্যমে আধুনিক হওয়ার প্রচেষ্টা (যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ খান), অন্যদিকে ইসলামের বিশুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আন্দোলন। দ্বিতীয় ধরনের প্রতিরোধই উপমহাদেশের ইসলামি সংস্কৃতির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

নিচে এ ধারার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি সংস্কার ও প্রতিরোধ আন্দোলনসমূহ উল্লেখ করা হল-

- **শাহ ওয়ালীউল্লাহর সংস্কার আন্দোলন (১৭৩১)**

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনা, মুসলিম সমাজে জেঁকে বসা অনৈক্য, কুসংস্কার, ও নৈতিক অধঃপতন দূর করা এবং মুসলিমদের হারানো রাজনৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধার করা।

- **ফরায়েজি আন্দোলন(১৮১৯)**

হাজী শরীয়তউল্লাহ (রহ.) নেতৃত্বে শুরু হওয়া ধর্মীয় শুদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের এ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রধানস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করা সকল ধরনের হিন্দুয়ানী রসম ও বিদআত (যেমন পীর পূজা, মহররমের তাজিয়া) দূর করে 'ফরায়েজ' বা ইসলামের মূল কর্তব্যগুলোর দিকে ফিরে আসা। এটি কৃষকদের মধ্যে জমিদারদের (অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সহযোগী) বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধের প্রেরণা যোগায়।

- **তারিকাহ-ই মুহাম্মদিয়া বা 'ওয়াহাবী আন্দোলন(১৮২০)**

সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) নেতৃত্বে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণ এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠা এবং জিহাদের মাধ্যমে শিখ ও ইংরেজদের কবল থেকে মুসলিম এলাকা মুক্ত করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। বাংলার তিতুমীর (মীর নিসার আলী) এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ নীলকর ও স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেন।

- **দারুল উলুম দেওবন্দ (১৮৬৬)**

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতভী
(রহ.) পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসনের মুখে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান (দীনী উলুম) ও জীবনধারাকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন অরাজনৈতিক দারুল উলুম দেওবন্দ। তখন হতে আজ অবধি এই শিক্ষাপীঠটি আধুনিক মুসলিম সমাজে ধর্মীয় নেতৃত্ব তৈরি করার এক শক্তিশালী কেন্দ্র ও মশালবাহী হিসেবে কাজ করে আসছে।

উপমহাদেশের বিভাজন ও সাংস্কৃতিক অবস্থান

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিভাজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু বিভাজন সত্ত্বেও, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক সংগ্রাম শেষ হয়নি। বরং ভিন্ন ভিন্ন

সামাজিক – রাজনৈতিক বাস্তবতায় ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রাম তিনটি রাষ্ট্রেই বিদ্যমান।

ক. ভারত: সংখ্যালঘু পরিচয়ের সংগ্রাম

ভারতে মুসলিমরা একটি বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এখানকার ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার মূল চ্যালেঞ্জ হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সংস্কৃতি ও ক্রমবর্ধমান উগ্র জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা।

- **সংরক্ষণের কেন্দ্র:** উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ, নদওয়াতুল উলামা-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতে ইসলামি জ্ঞান ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণাগার হিসেবে কাজ করছে।
- **মিশ্র সংস্কৃতি**: ভারতের মুসলিম সমাজে এখনও সম্মিলিত সংস্কৃতির প্রভাব প্রবল।বর্তমানে ক্রমবর্ধমান উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও আকাশ সংস্কৃতির দোরাত্ম্য সেখানে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক দাবিগুলোকে দুর্বল করে দিচ্ছে।
- **অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনা:** সংখ্যালঘু পরিচয়ের সংগ্রাম শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই নয়, বরং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রবল। বর্তমানে উচ্চস্তরের সরকারি চাকরি, প্রশাসন ও শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের হার উদ্বেগজনকভাবে কম। এই বঞ্চনা সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংঘাত বৃদ্ধি করছে এবং মুসলিম পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার ক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করছে।

খ. পাকিস্তান: রাষ্ট্রীয় ইসলামিকরণ ও আদর্শিক সংঘাত

পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই এখানে ইসলামি সংস্কৃতি জাতীয় পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে দুটি ধারা প্রবলভাবে সংঘাতময় ছিল:

- **আধুনিকতা বনাম ঐতিহ্যবাদ** : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অভ্যস্ত একশ্রেণির অভিজাত শাসকবর্গ ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যা চেয়েছেন, অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় নেতৃত্ব ইসলামের মূল নীতিগুলি কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।
- **সাংস্কৃতিক দ্বৈততা**: রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামিকরণ সত্ত্বেও, সমাজের উচ্চবর্গের মধ্যে পশ্চিমা পোশাক, ভাষা (ইংরেজি) ও জীবনধারার প্রভাব এখনও প্রবল। এটি এক ধরনের সাংস্কৃতিক দ্বৈততা তৈরি করেছে, যা পাকিস্তানকে তার ঘোষিত আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।
- **উগ্রবাদের চ্যালেঞ্জ:** রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আদর্শিক শূন্যতা কখনো কখনো উগ্রবাদী গোষ্ঠীর উত্থানকে মদদ দিয়েছে, যা ইসলামি সংস্কৃতির উদার ও মানবিক দিকটির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

গ. বাংলাদেশ: বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম পরিচয়

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল মূলত ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সেকুলারিজমের ভিত্তিতে। এটি পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে।

- **বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি:** বাংলাদেশে ইসলামি সংস্কৃতি বাংলা ভাষা ও লোকজ ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে মিশ্রিত। স্থানীয় সুফিবাদ ও পীর-ফকিরদের প্রভাব এখানে প্রবল। ওয়াজ-মাহফিল ও ধর্মীয় সাহিত্য বাংলায় হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের সাথে ধর্মের সংযোগ গভীর।
- **সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন:** স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ইসলামি আদর্শের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য বজায় ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে মধ্যপ্রাচ্য-প্রভাবিত ওয়াহাবী/সালাফি ধারার প্রভাবে পোশাক, শিল্পকলা ও সমাজে রক্ষণশীলতার প্রবণতা বেড়েছে।
- **বিভিন্ন তরিকা ও ফেরকাভিত্তিক দ্বন্দ্ব:** বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন তরিকা, ধর্মীয় ফেরকা ও উপদলগুলোর মধ্যে আদর্শিক ও সাংগঠনিক সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐতিহ্যবাহী সুফিবাদ, মাজারকেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং সংস্কারবাদী দলগুলোর মধ্যেকার তীব্র মতপার্থক্য সামাজিক বিভেদ ও অসহিষ্ণুতা সৃষ্টিতে একটি বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।
- **নতুন চ্যালেঞ্জ:** আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ এবং বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব এখানেও প্রবল।এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী মূল্যবোধের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন এখন বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য।

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

উপমহাদেশে ইসলামি সংস্কৃতি চর্চা বর্তমানে এক মহাগুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। একদিকে যেমন ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়ছে, তেমনি বিশ্বায়ন, আধুনিক প্রযুক্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কারণে নতুন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হচ্ছে—

- **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন**

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিমদের অমুসলিম বানানোর এবং ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছিল, সেই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংসলীলার প্রভাব আজও বিদ্যমান। পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা, ভোগবাদ ও বস্তুবাদী জীবনবোধের অনুপ্রবেশ উপমহাদেশের ইসলামি সংস্কৃতিকে দুর্বল করছে।

- **আদর্শিক শূন্যতা পূরণ**

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামি জীবনবোধের মধ্যে একটি কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় সাধন করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আজকের যুগে ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা দিতে হবে যা ধর্মীয় জ্ঞানে দৃঢ় থেকে নতুন বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক জটিলতার সমাধান দিতে সক্ষম হয়।

- **ঐক্য আনয়ন ও বিভেদ দূরীকরণ**

মুসলিমদের মধ্যে বংশ, গোত্র ও আঞ্চলিক বিদ্বেষ, যা অতীতে বড় বড় মুসলিম রাজত্বের পতনের কারণ হয়েছিল, আজও তা নতুন রূপ নিয়ে বিদ্যমান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা দল, উপদল ও তরিকাভিত্তিক দ্বন্দ্ব। এই অভ্যন্তরীণ বিভেদ দূর করে আল্লাহর ভাই ভাই হওয়ার নীতি প্রতিষ্ঠা করা একটি সুস্থ ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার জন্য অপরিহার্য।

উপমহাদেশের ইসলামি সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস একদিকে যেমন গৌরবময়, তেমনি অন্যদিকে গভীর পতনের গল্পও বহন করে। প্রায় সাত শতাব্দীর মুসলিম শাসন এই ভূমিকে স্থাপত্য, ভাষা, আইন ও শিল্পে এক অবিস্মরণীয় উত্তরাধিকার দিয়েছে।উপমহাদেশের সমাজ বাস্তবতায় ইসলামি সংস্কৃতি কেবল অতীত ঐতিহ্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং এটি একটি জীবন্ত শক্তি যা প্রতিনিয়ত স্থানীয়, বৈশ্বিক ও রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে।

এই বিশাল ভূখণ্ডের মুসলমানরা বর্তমানে এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। তারা তাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করবে, তার উপরই নির্ভর করছে উপমহাদেশে আগামী দিনে ইসলামি সংস্কৃতির গন্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায় - রেওয়াজের আবর্তে হারিয়ে যাওয়া ইসলাম

প্রথাগত ইসলামের স্বরূপ

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যে ইসলাম চর্চা দেখা যায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ ইসলাম না হয়ে, হয়ে উঠেছে নিছক **'কালচারাল ইসলাম'** বা **'ফোক ইসলাম',** যাকে **'প্রথাগত ইসলাম'** ও বলা যেতে পারে। এই প্রথাগত ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশের চেয়ে স্থানীয় ও পূর্বপুরুষ-প্রাপ্ত রেওয়াজ-প্রথার অন্ধ অনুসরণকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া।

এই ধাঁচের ইসলামি সংস্কৃতিতে বহু আচার-অনুষ্ঠান বিদ্যমান, যার মধ্যে খাঁটি ইসলামি প্রথা যেমন আছে, তেমনি এমন অসংখ্য প্রথাও রয়েছে যেগুলোর সাথে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সুদূরতমও সম্পর্ক নেই। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, সামাজিক রেওয়াজ-প্রথার জালে বাঁধা পড়া অধিকাংশ মুসলিম এই দু'য়ের মাঝে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম নয়। ফলস্বরূপ, অনেক জাহিলি রেওয়াজকেও তারা ইসলামের রীতিনীতি হিসেবে গণ্য করে ফেলে। যখনই কেউ এই প্রচলিত রেওয়াজগুলো নিয়ে আপত্তি জানায়, তখনই সাধারণ জনগণের মধ্যে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যা আধুনিক মুসলিম সমাজের এক গভীর সংকট হিসেবে প্রতীয়মান।

রেওয়াজ-প্রথা বনাম কুরআন-সুন্নাহ: আনুগত্যের সঙ্কট

মৌখিকভাবে প্রতিটি মুসলিম স্বীকার করেন যে, ইসলামের মূল ভিত্তি হলো কুর'আন এবং সুন্নাহ (রাসূল ﷺ-এর কথা, কাজ এবং মৌনসম্মতি)। কিন্তু যখনই তাদের দৈনন্দিন জীবনে শিকড় গেড়ে বসা প্রথাগুলোকে ত্যাগ করে সঠিকভাবে কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়, তখনই তারা নানা অজুহাত দিতে আরম্ভ করে।

সবচেয়ে বেশি যে কথাটি বলা হয়, তা হলো — "আমাদের অঞ্চলে এ ধরনের নিয়মের প্রচলন নেই"।

এই ধরনের অসার যুক্তিতে বহু মুসলিমের মনোজগৎ হয়ে আছে আচ্ছন্ন। কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি প্রচলিত আচার-প্রথা নিয়ে প্রশ্নও তোলেন, তবে মুরব্বিরা এই বলে তাদের তিরস্কার করেন যে, "তোমার পূর্বপুরুষরা যেহেতু কাজটিকে ভালো মনে করেছেন, সেহেতু তোমাদেরও এটা করা উচিত," অথবা, "তুমি কি মনে করো তোমাদের বাপদাদারা সবাই ভুল ছিল?"

এই মানসিকতা নতুন নয়; এটি যেন মক্কার মুশরিকদের যুক্তিরই প্রতিচ্ছবি, যাদেরকে আল্লাহ কুরআনে এই বলে ভর্ৎসনা করেছেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ

—"যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে আসো', তারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' তাদের পিতৃপুরুষদের যদি কোনো বোধ-বুদ্ধি না থাকে, কিছুই জানত না এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয় তবুও?" (আল-মা'ইদাহ, ৫:১০৪)

পশ্চিমা সভ্যতার সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে পরাজিত করে ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে বিশ্ববাসীর সামনে একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই এ রেওয়াজ কিংবা আচার-প্রথা নামক জাহিলি জঞ্জাল বর্জন করতে হবে। কেননা একমাত্র বিশুদ্ধ এবং ভেজালমুক্ত ইসলামই পশ্চিমা সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে মোকাবিলা করার সক্ষমতা রাখে। যে ইসলাম প্রথাগত জালে আবদ্ধ, তা নিজেই দুর্বলতায় পূর্ণ; এই দুর্বল কাঠামো কখনোই একটি শ্রেষ্ঠ সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

অনৈসলামিক রেওয়াজ-প্রথার শ্রেণিবিন্যাস

আচার-প্রথার নামে ইসলামের সাথে যেসব অনৈসলামিক রীতি-রেওয়াজ মিশে আছে, সেগুলোকে প্রধানত **চারটি** শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় —

১. প্রাক-ইসলামি প্রথা

ইসলাম যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, তখন নওমুসলিমরা তাদের ইসলাম-পূর্ব আচার-প্রথা সাথে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। ইসলামি আইন যদিও কিছু স্থানীয় প্রথাকে (উরফ) অনুমোদন দেয়, তবে তা অবশ্যই ইসলামের মূল বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

নিচে মুসলিম সমাজে কিছু প্রচলিত প্রাক ইসলামিক প্রথার উদাহরণ দেওয়া হল-

- **বিয়ের পোশাকের অনুকরণ:** ভারত-পাকিস্তান অঞ্চলে হিন্দুদের অনুকরণে কনেকে লাল শাড়ি পরানো হয়। যদিও ইসলামের কনের জন্য বিশেষ কোনো রঙ নির্ধারণ করা নেই, কিন্তু বিধর্মীদের অনুসরণ না করার সাধারণ বাধ্যবাধকতা থাকায় এ ধরনের অনুকরণীয় রেওয়াজ পরিত্যাজ্য।
- **শারীরিক ও বিশ্বাসগতভাবে ক্ষতিকর প্রথা:** পূর্ব আফ্রিকা, সুদান ও মিশরের মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত নারীদের ফারাওনিক খৎনা (FGM) এর মতো কুপ্রথা, যা শারীরিকভাবে বন্ধ্যাত্ব ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে এবং ইসলামের সাথে যার দূরতম সম্পর্ক নেই।
- **যৌতুক প্রথা:** হিন্দু ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে আগত যৌতুক প্রথা, যা ইসলামি বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামে স্বামী স্ত্রীকে মোহর প্রদান করবে, কিন্তু উপমহাদেশের মুসলিমরা প্রায়শই যৌতুক প্রথায় আক্রান্ত, যা নারী নির্যাতন ও কনেদাহের মতো নির্মমতার জন্ম দিয়েছে।

- **বিধবাদের পুনর্বিবাহে নিষেধাজ্ঞা:** নীতিগতভাবে এই প্রথা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ ইসলামে তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবাদেরকে বিয়ে করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

২. ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে গৃহীত প্রথা

অনেক ক্ষেত্রে মুসলিমরা পার্শ্ববর্তী সংস্কৃতিগুলো থেকে ধার করা অনৈসলামিক রেওয়াজ-প্রথা চর্চায় লিপ্ত হয়ে থাকে, যেমন-

- **রাসূলের জন্মদিন উদযাপন (মিলাদ):** এ প্রথার সূত্রপাত রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর মৃত্যুর প্রায় ৪০০ বছর পর, মিশরের ফাতিমী শিয়াদের হাতে, যা মূলত খ্রিষ্টানদের ক্রিসমাসের অনুকরণে শুরু হয়। মিলাদ মাহফিলে অনেক সময় নাচ-গান এবং সুস্পষ্ট শির্কপূর্ণ গজল গাওয়া হয়, যেখানে রাসূলের ওপর কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলি আরোপ করা হয়।
- **কবরের ওপর সৌধ বা মাজার নির্মাণ:** এটি এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে, তাজমহলের মতো বাড়াবাড়িও ইসলামি সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে পরিচিত। কবরকে ঘিরে এ ধরনের বাড়াবাড়ি একে উপাসনার স্থানে পরিণত করেছে, যেখানে দীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা মৃত ব্যক্তির কাছে অনুগ্রহ লাভের আশায় তাওয়াফ ও শির্কি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় (যেমন: আজমীরের মু'ঈন উদ্দীন চিশতীর সমাধি)।
- **বাগদানে আংটি দেওয়া:** ঔপনিবেশিক আমলে খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে গৃহীত এই প্রথাকে অনেকে ইসলামি সংস্কৃতির অংশ মনে করে, অথচ এটি মূলত খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসের প্রতীক।

৩. বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত বিষয়

সুফিবাদ বা মরমিবাদ (Mysticism) হলো স্রষ্টার সাথে মানুষের একীভূত হওয়ার ধারণা। এটি মূলত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর লেখায়, হিন্দু ধর্মের ব্রহ্মার সাথে মানবাত্মার মিলনের ধারণায় এবং খ্রিষ্টানদের সন্ন্যাসব্রতে পাওয়া যায়।

- **'ফানা' এবং 'ওসুল' দর্শন:** ৮ম শতাব্দীতে খ্রিষ্টানদের সন্ন্যাসবাদ চর্চার কেন্দ্রগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে, ইসলাম গ্রহণের দাবিদার একটি দল ইসলামি শারীয়াহর পাশাপাশি 'তরীকা' নামে নতুন এক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় 'ফানা' (মনের অহংবোধের অবসান) এবং 'ওসুল' (এই জীবনে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁর সাথে মিলে এক সত্তায় পরিণত হওয়া)।
- **'মাকামাত' ও 'হালাত' এবং যিকরের বিকৃতি:** এ অবস্থায় উন্নীত হতে কঠিন আধ্যাত্মিক অনুশীলন করা হয়, যা 'মাকামাত' (স্টেশন) এবং 'হালাত' (অবস্থা) নামে পরিচিত। এর মধ্যে সুরের তালে ভুল-শুদ্ধ বাক্য উচ্চারণের সাথে শরীর দোলানো, নাচানাচি,

গান-বাজনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডসহ এক বিশেষ প্রক্রিয়ার যিক্র চালু হয়, যা বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না।

- **ধর্মীয় দল (ফিরকা) ও মঠের উদ্ভব**: এর হাত ধরে 'সাবেরিয়া', 'কাদেরিয়া', 'চিশতিয়া' ইত্যাদির মতো হরেক রকম 'তরীকা' ও 'ফিরকা'র উদ্ভব ঘটে। হিন্দু-খ্রিষ্টানদের মঠের মতো করে এরাও 'খানকা', 'দরগাহ', 'মাজার' ও 'দরবার' ইত্যাদি নামে নিজেদের আস্তানা গড়ে তোলে।
- **শারীয়াহ্ থেকে অব্যাহতি**: সুফিদের অনেকে দাবি করে যে, কেউ 'ওসুল' এর পর্যায়ে উন্নীত হলে তার জন্য শারীয়াহর বিধি-নিষেধ (সালাত, সিয়াম, পর্দা ইত্যাদি) পালনের বাধ্যবাধকতা থাকে না।
- **মধ্যস্থতাকারীর ধারণা:** সুফিবাদ থেকে সবচেয়ে ক্ষতিকর ধারণাটি হলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজনীয়তা। এর ফলে পীর-বুযুর্গদের সরাসরি সাহায্য চাওয়া হয় কিংবা অন্ততপক্ষে তাদের আল্লাহর কাছে আবেদন-নিবেদন করার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪. ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং দলাদলি (মাযহাবী অন্ধত্ব)

মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামি আইনশাস্ত্রের চারটি স্বীকৃত ধারা বা মাযহাব (হানাফি, শাফে'ই, মালিকি এবং হাম্বলি) আছে। দুঃখজনকভাবে, মাযহাব অনুসরণের নামে অনেক সময় মুসলিমরা নিজেদের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সামাজিক রেওয়াজ-প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, যা মাযহাবের ভুল ব্যাখ্যা ও অন্ধ অনুকরণ হিসেবে বিভেদ সৃষ্টি করে(সভ্যতার সংকট, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা: ৪৭-৫৮)।

এপ্রসঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিধান এবং ফিক্হ-এর মধ্যকার পার্থক্যটি বোঝা জরুরি। মৌলিক বিধানসমূহ কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা, স্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল। অন্যদিকে, ফিক্হ হলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণাকৃত বিধান। ফিক্হ-এর প্রধান উপাদান হলো ইজতিহাদ (স্বাধীন গবেষণা), যা পরিস্থিতিভেদে পরিবর্তন হতে পারে। এই পার্থক্য প্রমাণ করে যে, ইসলামি জীবনব্যবস্থা সকল যুগ ও স্থানের জন্য শাশ্বত ও গতিশীল।

যারা ইসলামি আইনকে অপরিবর্তনীয় মনে করে, তারা এই গতিশীলতা বুঝতে পারে না। মূলত, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই অনেক মানুষ ১৪০০ বছর আগের বিধানকে আজকের যুগে অনুপযোগী মনে করে। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে মানুষের মৌলিক প্রকৃতি কখনোই পরিবর্তিত হয় না। প্রযুক্তিগত উন্নতি মানুষকে নৈতিকভাবে উন্নত করেনি। ফিক্হ শাস্ত্রের গতিশীলতা নিশ্চিত করে যে ইসলামি আইন যেকোনো পরিবেশ-পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য। মাযহাবি

আইনের ভুল প্রয়োগ এই ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেয়, উম্মাহকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেয় এবং তাকে স্থানীয় রেওয়াজের জালে আটকে ফেলে।

একমাত্র চাবিকাঠি : বিশুদ্ধতার দিকে হোক প্রত্যাবর্তন

রেওয়াজ-প্রথার জালে বাঁধা ইসলাম কেবল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিভেদই বাড়ায়নি, বরং মুসলিম উম্মাহকে তার মৌলিক ঐতিহ্য এবং সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ইসলামের এই দুর্বল ও বিকৃত কাঠামো পশ্চিমা সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সামনে দুর্বল এবং আত্মরক্ষায় অক্ষম। আমাদের সামনে সুস্পষ্ট পথ হলো: কুর'আন ও সুন্নাহর দিকে সরাসরি প্রত্যাবর্তন। এই প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই কেবল বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকল যুগের জন্য একটি শাশ্বত, কল্যাণকর ও গতিশীল জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হবে।এই আদর্শিক পুনরুজ্জীবনই হলো বর্তমান মুসলিম সভ্যতার সংকট উত্তরণের চাবিকাঠি।

সপ্তম অধ্যায় - অন্ধ অনুকরণে সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি: আধুনিক মুসলিম সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়

আত্মপরিচয়ের সংকট: অনুকরণ ও সাংস্কৃতিক বিচ্যুতির প্রেক্ষাপট

বর্তমান মুসলিম উম্মাহ এক গভীর সাংস্কৃতিক বিচ্যুতির মুখে দাঁড়িয়ে, যার মূল চালিকাশক্তি হলো পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই প্রক্রিয়াটি একটি "সাংস্কৃতিক ব্যাধি"-তে রূপান্তরিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ পশ্চিমা বিশ্বের একচেটিয়া অর্থনৈতিক সাফল্য, প্রযুক্তিগত আধিপত্য এবং দৃশ্যমান উন্নতির সঙ্গে মুসলিমদের শোচনীয় অবস্থার নৈরাশ্যজনক তুলনা। এই তুলনা থেকেই জন্ম নিয়েছে এমন একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, ইসলামের মূল্যবোধগুলো আধুনিক প্রগতির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং পশ্চিমা জীবনধারা ও অর্থনৈতিক মডেলের সঙ্গে তাল মেলালেই কেবল কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব।

এই বিশ্বাসের সূচনা হয়েছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে। কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ইসলামকে ধরে নিয়েছেন প্রগতির অন্তরায় হিসেবে। মুসলিম বিশ্বের অবক্ষয় থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হিসেবে পাশ্চাত্যের অনুকরণের মত হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতেও তারা পিছপা নন। প্রকৃতপক্ষে তা চরম পথভ্রষ্টতারই নামান্তর। কেননা সভ্যতা নিছক বাহ্যিক অনুকরণ নয়; এর একটি প্রাণ ও অন্তঃসত্তা রয়েছে। যখন আমরা কোনো সভ্যতার বাহ্যিক রূপ অনুসরণ করি, তখন এর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও চলমান প্রভাব ধীরে ধীরে আমাদের চিন্তার জগৎ ও মূল্যবোধকে দখল করে নেয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

—"*যে ব্যক্তি কোনো কওমকে অনুকরণ করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত।"* (মুসনাদে আহমাদ, ২/৫০; আবু দাউদ, ৪০৩১)

এ হাদিসটি কোনো মৃদু ধমকি নয়, বরং একটি অনিবার্য বাস্তবতার সতর্কতাস্বরূপ।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বিজাতীয় সংস্কৃতির এ অনুকরণপ্রবণতাই আজ মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে ইসলামি সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষা এবং পুনর্জাগরণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্ধ অনুকরণপ্রবণতার ফলে সৃষ্ট মুসলিম সাংস্কৃতিক বিচ্যুতির প্রধান ক্ষেত্রগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

১. গণমাধ্যম ও বিশ্বায়ন : Modern Mimicry Crisis

বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যম, ফ্যাশন এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে মুসলিম সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় চরম রূপ ধারণ করেছে, যা "Modern Mimicry Crisis" বা আধুনিক অনুকরণের সংকট তৈরি করে। পশ্চিমা ভোগবাদী পরিচয় নির্মাণই যেন আজ মুসলিম তরুণদের চালিকাশক্তি।এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রসার পাচ্ছে—

- **সেলিব্রিটি কালচার**

ইসলামি আদর্শের অনুকরণীয় মডেলের পরিবর্তে, গণমাধ্যম প্রচারিত সেলিব্রিটি কালচার তরুণদের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। তাদের জীবনধারা, ফ্যাশন এবং আচরণ অন অনৈসলামিক মূল্যবোধকে করে তুলছে স্বাভাবিক।

- **ভোগবাদী পরিচয় নির্মাণ**

মিডিয়া ও ব্র্যান্ডিং-এর প্রভাবে একজন মুসলিমের পরিচয় এখন তার ইমান বা নৈতিক অবস্থান দিয়ে নয়, বরং তার আয়-ইমেজ-ব্র্যান্ডিং ও ভোগের সামর্থ্য দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে। সফলতা মানেই ভোগ; সাদাসিধে জীবন মানেই ব্যর্থতা।

- **সাংস্কৃতিক সংকরায়ন**

বিশ্বায়নের প্রভাবে মুসলিম সমাজে এক প্রকার সাংস্কৃতিক সংকরায়ন জন্ম নিয়েছে, যেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ইসলামি মূল্যবোধ এবং পশ্চিমা ভোগবাদী উপাদানগুলো মিলে এক জগাখিচুরি রূপ ধারণ করেছে। পরিণামে মুসলিম সত্তা তার মূল সাংস্কৃতিক ভিত্তি থেকে হয়ে পড়ছে বিচ্ছিন্ন । ভাষার ব্যবহারে দেখা যাচ্ছে এক মিশ্রিত বিকৃতি। পোশাকের ক্ষেত্রেও শালীনতার চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ও সামাজিক প্রদর্শন প্রাধান্য পাচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় মুসলিম সমাজ যখন আধুনিকতার দাবি করছে, তখন একইসাথে নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি তার আনুগত্যও হয়ে পড়ছে দুর্বল।

২. ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস নিয়ে বিভ্রান্তি

বর্তমান মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কর্তৃত্বের উৎস নিয়ে চরম বিভ্রান্তি ও সংকট (Authority Crisis) বিদ্যমান। গভীর জ্ঞানের বদলে তথ্যের সহজলভ্যতা একটি নতুন কাঠামো তৈরি করেছে, যা সৃষ্টি করছে নানাবিধ জটিলতার—

- **স্কলার বনাম ইনফ্লুয়েন্সার**

ইসলামি জ্ঞানচর্চার নববী উত্তরাধিকারবাহী সম্মানিত আলিমসমাজ (Islamic scholar) এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মর্যাদা কমে গিয়েছে । এর পরিবর্তে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে জনপ্রিয়, সুদর্শন ও সহজে অনুসরণযোগ্য ইনফ্লুয়েন্সার, যাদের রয়েছে দ্বীনি জ্ঞানে বিরাট ঘাটতি; তারাই ধর্মীয় জ্ঞানের নতুন উৎসে পরিণত হচ্ছে, যা ডেকে আনতে পারে এক ভয়াবহ পরিণাম।

- **ইসলামের সংক্ষিপ্ত রূপায়ন বা Short-form Islam**

গভীর, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় আলোচনা এবং অধ্যয়নের বদলে তরুণ সমাজ ঝুঁকছে শর্ট-ফর্ম ইসলামের দিকে। টিকটক বা রিলসের মতো প্ল্যাটফর্মে ৩০-৬০ সেকেন্ডের ভিডিওতে ইসলামি মাসআলা বা উপদেশ শেয়ার করা হচ্ছে, যা জ্ঞানের গভীরতা ও প্রেক্ষাপটকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

- **গভীর জ্ঞান বনাম আবেগী কনটেন্ট**

চিন্তামূলক গভীর জ্ঞান বা জটিল ফিকহি আলোচনার চেয়ে, আবেগপ্রবণ ও দ্রুত বিনোদনমূলক কনটেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে দ্বীন সম্পর্কে একটি আবেগসর্বস্ব ও অসম্পূর্ণ ধারণা তৈরি হচ্ছে, যা সামান্য যুক্তির বাধার মুখে ভেঙে পড়তে পারে।

৩. বহুধা বিভক্ত আত্মপরিচয়

অন্ধ অনুকরণের ফলস্বরূপ মুসলিম সমাজে আত্ম-পরিচয় চরমভাবে বিভক্ত (Fragmented) হয়ে পড়েছে।

- **ফিতরাতগত মুসলিম পরিচয়ের প্রাধান্য হ্রাস**

একজন মুসলিমের ফিতরাতগত পরিচয় (উম্মাহর অংশ হওয়া, শারীয়াহর অনুসরণ) আজ প্রতিযোগিতা করছে পশ্চিমা বিভিন্ন লাইফস্টাইল আইডেন্টিটির সঙ্গে (ডেটিং, ফ্যাশন ট্রেন্ড, মিউজিক ফ্যানডম)। মানুষ নিজের জীবনযাত্রাকেই ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

- **ঈমানি আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে বিভাজন**

"আমি কে?"—এই মৌলিক প্রশ্নে মুসলিম তরুণ সমাজ আজ দ্বিধাবিভক্ত। তারা কি আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে তাদের পরিচিতিকে সীমাবদ্ধ রাখবে? নাকি একজন সেক্যুলার, গ্লোবাল নাগরিক, যে ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় হিসেবে দেখে?এই বিভাজন জন্ম দিচ্ছে মানসিক অস্থিরতা ও মুনাফিকির।

- **অনুসরণযোগ্য আদর্শের অভাববোধ**

ভোগবিলাসের চাকচিক্যময়তায় হারিয়ে গিয়ে মুসলিম তরুণেরা পরিত্যাগ করছে নববী আদর্শ। তার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট হচ্ছে অনুকরনীয় রোল মডেলের অভাববোধ; এতে আক্রান্ত তরুণসমাজ পশ্চিমা সেলিব্রিটি ও ইনফ্লুয়েন্সারদের অন্ধভাবে অনুকরণ করছে, যা তাদের বিচ্ছিন্ন করছে ইসলামি মূল্যবোধ থেকে ।

৪. নৈতিক দিকনির্দেশক কাঠামোর পতন (Moral Infrastructure Collapse)

পশ্চিমা ভোগবাদের অনুকরণ মুসলিম সমাজের শতাব্দী প্রাচীন নৈতিক দিকনির্দেশক কাঠামো ভেঙে দিচ্ছে।এর পরিণামে দেখা দিচ্ছে—

- **দুর্বল পারিবারিক মূল্যবোধ** পরিবার, যা মূলত ইসলামি নৈতিকতার প্রথম পাঠশালা, আজ দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত। পারিবারিক মূল্যবোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় মুসলিম সন্তানরা শৈশব থেকেই সঠিক নৈতিক দিকনির্দেশনা পাচ্ছে না।
- **সামাজিক জবাবদিহিতা হ্রাস**

সামাজিক ও ধর্মীয় জবাবদিহিতা প্রায় নেই বললেই চলে। সামাজিক চাপ ও সমালোচনা এখন আর নৈতিক স্খলন থেকে বিরত রাখার মতো শক্তিশালী নয়।

- **নৈতিক শিক্ষা >বিনোদন-ভিত্তিক জীবনদৃষ্টি**

গভীর নৈতিক শিক্ষার স্থান এখন দখল করে নিয়েছে বিনোদন ভিত্তিক লিবারেল জীবনদৃষ্টি। হালাল-হারামের আলোচনা এখন আর জীবনের মৌলিক কাঠামো নয়, বরং ব্যক্তিগত পছন্দ বা আপোষের বিষয়।

৫. ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা

পশ্চিমা দর্শনের মূলে থাকা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা (Hyper-individualism) আজ মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে সম্মিলিত দায়িত্ববোধকে প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে।

- **ভেঙে পড়া নৈতিকতা**

"আমার স্বাধীনতা, আমার পছন্দ" কিংবা 'সঠিক-ভুল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার'— এই স্লোগানগুলোর প্রসার ইসলামি নৈতিকতার দৃঢ় ভিত্তিকে ভেঙে দিচ্ছে। দ্বীনের স্পষ্ট নীতি-নৈতিকতা বা শারীয়াহর রীতিনীতির চেয়ে ব্যক্তিগত সুখ ও ইচ্ছাই এখন প্রাধান্য পাচ্ছে।

- **দায়িত্ববোধের বিলুপ্তি**

উম্মাহর প্রতি সম্মিলিত দায়িত্ববোধ প্রায় শূন্যের ঘরে নেমে এসেছে। সবাই আজ কেবল নিজের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি ও সাফল্যের জন্যই কাজ করছে।

৬. ডিজিটাল বিশ্বে নৈতিক বিচ্যুতি

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সহজলভ্যতা মুসলিমদের নৈতিকতা ও আচরণের ওপর চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যাকে **Digital Disinhibition** বা **ডিজিটাল নৈতিক বিচ্যুতি** বলা যেতে পারে।

- **অনলাইন আচরণে অফলাইনের নৈতিকতার অকার্যকারিতা**

অনেকেই মনে করে, অনলাইন আচরণ অফলাইনের নৈতিকতা থেকে আলাদা। ফলে অফলাইনে কখনোই করত না এমন আপত্তিকর বা অশ্লীল কনটেন্টও তারা অনলাইনে দেখে থাকে ও তৈরিতে জড়িত থাকে।

- **অনলাইনে হারাম/হালাল মানদণ্ড বিলুপ্তি**

অনলাইন জগতে হারাম/হালাল মানদণ্ড একরকম গায়েব হয়ে পড়ে। চোখের হিফাজত, জিনা, বা গীবতের মতো বিষয়গুলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সহজেই লঙ্ঘিত হচ্ছে।

- **পরিচয়ের গোপনীয়তার ফলে নৈতিকতায় শিথিলতা**

অনলাইন জগতে Anonymity বা নাম-পরিচয়হীনতা মানুষকে আরও বেশি নৈতিকভাবে শিথিল হতে উৎসাহিত করছে।

৭. সম্পর্ক ও যৌনতার বিকৃতি

পশ্চিমা সমাজের অনুকরণে মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক এবং যৌনতার সংস্কৃতি বিকৃত হচ্ছে।

- **ডেটিং ও হুকআপ কালচার**

পাশ্চাত্যের Dating culture এবং Hookup trends-এর অনুকরণ বিবাহ-পূর্ব সম্পর্ককে উৎসাহিত করছে, যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী।

- **বিলাসিতার কারণে বিয়েকে বর্জন**

বিয়েকে কঠিন ও বিলাসিতাপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে, যা যৌনতার বিকৃতি ঘটাচ্ছে। অন্যদিকে, অনেকে আবার পশ্চিমা মডেলের হতাশাজনক ফলাফল দেখে বিয়েকেই সম্পূর্ণ বর্জন করার মানসিকতা দেখাচ্ছে।

- **পশ্চিমা সম্পর্কের মডেল অনুকরণ**

বিয়ের উদ্দেশ্য, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও সম্পর্ক নির্ধারণে ইসলামি আদর্শের পরিবর্তে পশ্চিমা সম্পর্কের মডেল অনুকরণ করা হচ্ছে যা পারিবারিক ব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করে তুলছে।

৮. সময়ের নৈতিক ব্যবহার সংকট

আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্বের Attention Economy (মনোযোগের অর্থনীতি) মুসলিমদের চিন্তার কাঠামো দখল করে নিয়েছে, যা সময়ের নৈতিক ব্যবহারের সংকট তৈরি করেছে।

- **চিন্তার কাঠামো দখল**

পশ্চিমা **Attention economy** বা মনোযোগের অর্থনীতি মানুষের চিন্তার কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই অর্থনীতি গভীর চিন্তা বা জ্ঞান অর্জনকে মূল্য দেয় না, বরং দ্রুত ও ক্ষণস্থায়ী বিনোদনকে প্রাধান্য দেয়।

- **কুরআন/ইলমের কাজে সময় ব্যয় কমা**

কুরআন/ইলম (জ্ঞান) অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় হচ্ছে রিলস/টিকটক বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে মাল্টিস্ক্রল করে।

- **গভীর চিন্তাশক্তি হ্রাস**

দীর্ঘমেয়াদী গভীর চিন্তাশক্তি করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং জন্ম নিচ্ছে অগভীর, আবেগপ্রবণ মন।

সমাধানের পথ : সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার সাথে প্রযুক্তির সমন্বয়

পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের সাংস্কৃতিক ব্যাধি মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মেরুদণ্ডকে ক্ষয় করছে। এই সংকটকে কেবল নৈতিক স্খলন নয়; বরং আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং ডিজিটাল অস্তিত্বের মৌলিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এর সমাধানের পথে

অগ্রসর হতে প্রয়োজন যুগের নতুন সমস্যাগুলোর (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের নৈতিকতা, ডিজিটাল ফিকহ, বিগ ডেটার চ্যালেঞ্জ) জন্য ইসলামি সমাধান উদ্ভাবনের।

প্রযুক্তি, অর্থনীতি বা হাই-টেক উন্নতি কখনোই নৈতিক নিরপেক্ষতা দাবি করে না। বরং, ইসলামকে বাদ দিয়ে পশ্চিমা আদলে আধুনিক হওয়ার অর্থ হলো, ইসলামের বাস্তবধর্মী জীবনব্যবস্থাকে নিছক একটি প্রাণহীন রীতিনীতিতে পরিণত করা। আজকের মুসলিমদের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো, কীভাবে পশ্চিমা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ গ্রহণ করেও নিজেদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক স্বকীয়তা (Cultural and Moral Autonomy) রক্ষা করা যায়।

অষ্টম অধ্যায় - উত্তরণের উপায় : ইসলামি জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন (কর্মপরিকল্পনা ও নেতৃত্ব)

সংকট থেকে আন্দোলন – কর্মপরিকল্পনার দিকে যাত্রা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আধুনিক সমাজ বাস্তবতায় মুসলিম উম্মাহর আদর্শিক স্থবিরতা, সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি এবং এর কারণসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। চিন্তাবিদগণ স্পষ্ট করেছেন যে, নিছক উপদেশ বা সমালোচনার মাধ্যমে নয়, বরং সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব, প্রশিক্ষণ এবং ইজতিহাদ ও জিহাদের ঝান্ডা তুলে ধরার মাধ্যমেই জাতির পুনর্জাগরণ সম্ভব।

তাই উম্মাহর বর্তমান দুরবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো চিন্তার পুনর্গঠনকে একটি সুসংগঠিত আন্দোলন বা কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি সুসংগঠিত ও বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ইসলামী নেতৃত্ব তৈরির সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ এ অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

ইসলামি নেতৃত্বের আন্দোলন ও নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি নেটওয়ার্ক হলো সেই কেন্দ্রবিন্দু, যা উম্মাহর বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একটি একক লক্ষ্যের দিকে চালিত করে। ইসলামি সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা এক বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা, যা একটি রাজ্য ব্যবস্থাপনার সমতুল্য। এই ব্যবস্থাপনা তৈরি করা একক ব্যক্তির কাজ নয়; বরং একটি সুসংগঠিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আদর্শে দৃঢ় সংগঠনের মাধ্যমেই এটি সম্ভব, যা আমরা নববি সীরাহ অধ্যয়নের মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই অনুধাবন করতে পারি। এই নেটওয়ার্কের প্রধান কাজগুলো হবে—

ক. আদর্শিক বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ: বিজাতীয় সভ্যতার প্রবল চাপের মুখেও ইসলামের বিশুদ্ধ আদর্শ ও চিন্তাধারাকে সকল প্রকার বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।

খ. নৈতিক ও চারিত্রিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা: সমাজে ইসলামের নৈতিক মানদণ্ডকে একটি বাস্তব রূপ দিয়ে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় মডেল তৈরি করা।

গ. কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের বিকাশ: নতুন জ্ঞান ও নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান নেতৃত্ব তৈরির জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ করা।

ঘ. সম্পদ ও দক্ষতার সমন্বয়: উম্মাহর সকল আর্থিক, বৌদ্ধিক ও মানবসম্পদকে পুনর্জাগরণের লক্ষ্যের দিকে কেন্দ্রীভূত করা।

ঙ. দাওয়াত ও ঐক্য: উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক দাওয়াত পৌঁছানো এবং সকল মুসলিমকে জাতীয়তাবাদ ও গোত্রীয় বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে তুলে ঐক্যবদ্ধ করা।

ইসলামি নেতৃত্বের আন্দোলন ও তার প্রকৃতি

ইসলামি নেতৃত্বের আন্দোলন হবে এমন এক বৌদ্ধিক ও প্রায়োগিক বিপ্লব, যা পুরাতন স্থবিরতাকে ভেঙ্গে নতুন চিন্তা ও কর্মের সূচনা করবে। এই আন্দোলনের প্রকৃতি হবে নিম্নরূপ—

- **বিপ্লবী পরিবর্তন:** এটি কেবল সংস্কার নয়, বরং সমাজের সকল দিক (শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি) পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে।
- **তাওহীদ-ভিত্তিক সরকার:** আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে এমন এক সরকার বা সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (তাওহীদ) কার্যকর হবে, এবং মানুষের জীবনে বিজাতীয় মদদপুষ্ট হীনমন্যতার কোনো প্রভাব থাকবে না।
- **ইজতিহাদের ঝান্ডা:** আন্দোলনকে অবশ্যই আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলোর শরীয়াহভিত্তিক সমাধানের জন্য ইজতিহাদের ঝান্ডা তুলে ধরতে হবে।

১. প্রথম ধাপ : নতুন নেতৃত্ব কারা দেবে? – আদর্শ মুসলিম তৈরির প্রক্রিয়া

নতুন নেতৃত্বদানের জন্য ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান আত্মবিশ্বাসী এক শ্রেণির প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই নতুন নেতৃত্ব অতীতের আলেম বা পশ্চিমা শিক্ষিত এলিটদের মধ্য থেকে আসবে না, বরং এক সমন্বিত আদর্শিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি হবে।

ক. নতুন নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য: দ্বীনি জ্ঞান ও প্রাযুক্তিক দক্ষতার সমন্বয়

নতুন নেতৃত্বের মূল পরিচয় হবে তারা হবেন আদর্শ মুসলিম, যিনি একদিকে যেমন ইসলামের মৌলিক জ্ঞানে সুগভীর হবেন, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে হবেন সুপণ্ডিত। এই নেতৃত্ব হবেন—

- **দীনি জ্ঞানে সুদৃঢ় ('আলিম'):** কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকহে গভীরতা থাকবে। ইসলামের মূল স্পিরিট ও গতিশীলতা সম্পর্কে অবগত থাকবেন।
- **আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী :** অর্থনীতি, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বশেষ জ্ঞান অর্জন করবেন। জ্ঞানের উৎস সর্বজ্ঞ স্রষ্টা মহান আল্লাহ—এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তারা জ্ঞানের সকল শাখায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবেন।
- **নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব:** ব্যক্তিগত জীবনে হবেন নিষ্কলুষ, বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং আত্মবিশ্বাসী। তারা হবেন সমাজে ইসলামের জীবন্ত প্রতীক।

খ. নেতৃত্ব নির্বাচনের মাপকাঠি

নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে বংশ বা গোত্র নয়, বরং তিনটি মৌলিক গুণাবলী প্রাধান্য পাবে—

১. আদর্শিক দৃঢ়তা : আল্লাহর সার্বভৌমত্বে (তাওহিদ) এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার আপস না করা।

২. চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব (তাকওয়া): ব্যক্তিগত লোভ, দুর্নীতি এবং বিলাসী জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা।

৩. বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা (ইজতিহাদী মানসিকতা): আধুনিক বিশ্বের জটিল সমস্যাগুলো অনুধাবন করে তার ইসলামি সমাধান বের করার ক্ষমতা।

২. দ্বিতীয় ধাপ: নেতৃত্ব তৈরির কর্মপরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ মডেল

নতুন নেতৃত্ব তৈরির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং বহু-স্তরীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা অপরিহার্য। এই মডেলকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা যায়: আদর্শিক, প্রায়োগিক ও সাংগঠনিক।

ক. আদর্শিক স্তর

আত্মবিশ্বাস ও চিন্তার পরিশুদ্ধি—

- **তাওহীদ ও রিসালাতের গভীর জ্ঞান:** কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক জ্ঞানকে বিতর্কমুক্ত ও সর্বজনীনভাবে উপলব্ধি করা। বৈশ্বিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের অবস্থান স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা।
- **ইসলামী ইতিহাস ও পতনের কারণ বিশ্লেষণ:** মুসলিম বিশ্বের উত্থান-পতন, বিশেষত ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কারণগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করা, যাতে অতীতের ভুলগুলো পুনরাবৃত্তি না হয়।
- **বিদ'আত ও জাহেলিয়াতমুক্ত জীবন:** ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করা সকল প্রকার বিধর্মী রসম ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকা এবং ইসলামের বিশুদ্ধ রূপটি অনুসরণ করা।

খ. প্রায়োগিক স্তর: সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা

নেতৃত্বকে অবশ্যই সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সক্ষম হতে হবে। তাই তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সমন্বয় জরুরি।

- **দ্বৈত শিক্ষা বাতিল:** ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা ও সেকুলার কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে একীভূত করা। নতুন নেতৃত্বকে অবশ্যই ফিকহ, উসুল, তাফসীর, হাদীসের পাশাপাশি অর্থনীতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এবং প্রযুক্তিতে শীর্ষস্থানীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
- **ইজতিহাদি প্রশিক্ষণ:** আধুনিক ফিকহী সমস্যাবলীর উপর নিয়মিত ওয়ার্কশপ এবং গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। নতুন প্রযুক্তি, যেমন এআই (AI), বায়োএথিকস, বা ডিজিটাল ফাইন্যান্সের শরিয়াহসম্মত সমাধান বের করার জন্য তাদের প্রশিক্ষিত করা।
- **সামাজিক দক্ষতা:** জনসম্পর্ক, যোগাযোগ (দাওয়াহ), মিডিয়া ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা।

গ. সাংগঠনিক স্তর: কর্মী থেকে নেতৃত্ব

সংগঠন বা নেটওয়ার্কের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে:

- **কর্মী থেকে মুত্তাকী:** সংগঠনের প্রাথমিক স্তর থেকে কর্মীদের মধ্যে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব (তাকওয়া) ও দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দেখতে হবে।

- **ধাপে ধাপে দায়িত্ব:** ছোট থেকে বড় দায়িত্বে ধাপে ধাপে পদোন্নতির মাধ্যমে নেতৃত্বের পরীক্ষা হবে। কঠিন পরিস্থিতিতে আদর্শে অবিচল থাকার ক্ষমতা, দল পরিচালনার দক্ষতা এবং নৈতিকতা কঠোরভাবে যাচাই করা হবে।
- **পারস্পরিক জবাবদিহিতা:** নেতৃত্বকে অবশ্যই সংগঠনের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা কাঠামোর অধীনে থাকতে হবে, যেখানে কোনো নেতা স্বেচ্ছাচারিতা বা নৈতিক বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে নয়।

৩. তৃতীয় ধাপ: উম্মাহকে এগিয়ে নেওয়ার মহাপরিকল্পনা (The Grand Strategy)

নতুন নেতৃত্ব ও তাদের নেটওয়ার্কের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো উম্মাহকে হীনমন্যতা ও পতনের অবস্থা থেকে বের করে এনে বিশ্বে নেতৃত্বদানকারী শক্তিতে পরিণত করা। এই মহাপরিকল্পনা তিনটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে— দাওয়াত, ঐক্য এবং প্রতিষ্ঠা।

ক. ব্যাপক দাওয়াত ও গণ-সংযোগ

সর্বাত্মকভাবে ব্যাপক দাওয়াত-এর উপর জোর দেয়া-

- **বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াত:** উচ্চশিক্ষিত, চিন্তাশীল ও গবেষক শ্রেণির কাছে ইসলামের গতিশীল ও দার্শনিক শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা। পাশ্চাত্য বস্তুবাদ, মানবতাবাদ এবং সেকুলারিজমের বিকল্প হিসেবে ইসলামের জীবনব্যবস্থাকে যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা।
- **গণ-দাওয়াত:** আধুনিক প্রযুক্তি, বিশেষ করে ডিজিটাল মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া এবং মাতৃভাষাকে (যেমন বাংলা) ব্যবহার করে ইসলামের সরল ও মানবিক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। লোকজ কুসংস্কার (জাহেলিয়াত) এবং শিরক-বিদআত থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য সচেতনতা তৈরি করা।
- **নৈতিক মডেল তৈরি:** ব্যক্তিগত জীবনে সততা, ন্যায় এবং উন্নত চরিত্রের মডেল তৈরি করে দাওয়াত দেওয়া। এটি হবে একটি নীরব কিন্তু শক্তিশালী দাওয়াত।

খ. ইসলামি ঐক্য (ইত্তেহাদ) ও জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে অবস্থান

উম্মাহর অগ্রগতির জন্য সকল মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

- **জাতীয়তাবাদ পরিহার:** ইউরোপ থেকে আমদানি করা জাতীয়তাবাদ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নতুন নেতৃত্বকে অবশ্যই উম্মাহকে জাতীয়তাবাদ, গোত্রবাদ ও আঞ্চলিক বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে তুলে এক একক আদর্শিক সত্তা হিসেবে সংগঠিত করতে হবে।
- **ফিরকাগত সংঘাত নিরসন:** শিয়া, সুন্নী, হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদি ফিরকাগত বা মাযহাবগত বিরোধকে আদর্শিক কাঠামোর মধ্যে রেখে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। বৃহত্তর লক্ষ্যের জন্য সকল মুসলিম শক্তিকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

- **সহযোগিতার অর্থনৈতিক মডেল:** মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা জোরদার করা, যাতে তারা পশ্চিমা অর্থনীতির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারে।

গ. ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বব্যাপী প্রভাব

এই পুনর্গঠন আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সমাজের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে একটি ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

- **পরিবর্তনের কৌশল:** ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে পারে, অথবা সমাজের গভীরে ব্যাপক দাওয়াত ও নৈতিক বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে হতে পারে।
- **ন্যায় ও ইনসাফের মডেল:** প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকারকে অবশ্যই বিশ্ববাসীর জন্য ন্যায়, অর্থনৈতিক সমতা ও মানবাধিকারের একটি উচ্চতর মডেল হিসেবে কাজ করতে হবে। এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদমুক্ত, বৈষম্যহীন এবং মানবকল্যাণমুখী হবে।
- **বৈশ্বিক দাওয়াহ:** একটি সফল ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজ পশ্চিমা বিশ্বের কাছে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তব প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। এই সফল মডেলের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বব্যাপী তার দাওয়াহ (আহ্বান) আরও জোরদার করতে পারবে।

ইসতিকামাহ : ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা

ইসলামি জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন কোনো স্বল্পমেয়াদী প্রকল্প নয়; এটি একটি দীর্ঘ, ত্যাগ ও সংগ্রামের পথ। এই পথে সফলতা অর্জনের জন্য **ইসতিকামাহ** (অবিচলতা বা দৃঢ়তা) হলো মূলমন্ত্র।

নতুন নেতৃত্বকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তাদের কাজ কেবল অতীতের ইতিহাস সংরক্ষণই নয়, বরং নতুন ইতিহাস সৃষ্টিও। তাঁরা হবেন এমন এক সাহসী বাহিনী, যারা ইসলামকে ভিন্ন সংস্কৃতির আবহে ম্লান বা বিকৃত হতে না দিয়ে বীরের মতো বিশ্ববাসীর সামনে এর প্রকৃত মহিমা ও শক্তি প্রদর্শন করবেন। এপথে ব্যর্থতা আসলেও আদর্শিক দৃঢ়তা ধরে রেখে ক্রমাগত উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ করে যেতে হবে; এটাই হলো উম্মাহর উত্তরণ ও পুনর্জাগরণের সঠিক পথ। নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংগঠনিক—এই ত্রি-মাত্রিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ তাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর পথপ্রদর্শক হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হবে।

শেষ কথা

ইসলামের প্রদত্ত জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ অটল, কার্যকর এবং সর্বযুগোপযোগী।

এটি এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা ব্যক্তিগত ধার্মিকতার পাশাপাশি সমাজগঠন ও সংস্কৃতির রূপায়ণে এক সুসংহত কাঠামো প্রদান করে। আর এ দিকনির্দেশনার সঠিক প্রয়োগই আজকের বিশ্বকে নৈরাজ্য ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

এ গবেষণা চূড়ান্তভাবে এই বার্তাই দেয় যে, আজকের মুসলিম সমাজে বিরাজমান টানাপোড়েন ও সংকট মূলত কোনো আদর্শগত ব্যর্থতার ফল নয়; বরং তা দীর্ঘকাল ধরে চলা বিচ্যুতির পরিণতি।

দুর্বলতা ইসলামি আদর্শের নয়— বরং সেই আদর্শ বাস্তবায়নের।

আর এ বিচ্যুতি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নেতৃত্বের সংকট, সাংগঠনিক দুর্বলতা, এবং সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি।

কিন্ত যেহেতু সমস্যার শিকড় ব্যর্থতা নয়, বিচ্যুতি—তাই সমাধানও অর্জনযোগ্য, বাস্তবভিত্তিক এবং পুনর্গঠনের সকল পথই রয়েছে উন্মুক্ত।

ইসলামের প্রদত্ত জীবনবিধান, তার সামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ –এই ত্রয়ী স্তম্ভ যদি যোগ্য ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের অধীনে আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করা হয়, তবে মুসলিম উম্মাহ কেবল নিজেদের অভ্যন্তরীণ জটিলতাই কাটিয়ে উঠবে না, বরং সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য শান্তি, ইনসাফ এবং নৈতিকতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

[১] ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস: সভ্যতার সংকট: জিম তানভীর অনূদিত; সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, মে ২০১৬

[২] মুহাম্মাদ আসাদ: ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত: জাকারিয়া মাসুদ অনূদিত ; সাবিল পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০২২

[৩] সাইয়েদ আবদুল্লাহ হাসানী নদভী: ইসলাম ধর্ম : সমাজ : সংস্কৃতি: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী; জমিয়তে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ একাডেমী বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৯

[৪] সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ): মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব: জুলফিকার আলী নদভী অনূদিত; মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুহাম্মদ ব্রাদার্স, আগস্ট ২০১২

[৫] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী: ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা: মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান; আধুনিক প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৮

[৬] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী: আজকের দুনিয়ায় ইসলাম: মুনীর উদ্দীন আহমদ অনূদিত; আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪

[৭] আবদুল মান্নান তালিব: ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন; আধুনিক প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, মার্চ ২০০৮

[৮] হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়্যব (রহ.): ইসলাম বনাম বিজাতীয় অনুকরণ: মাওলানা কারামত আলী নিযামী অনূদিত; আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স, আগস্ট ২০০৭

[৯] ড. আবদুলহামীদ আহমদ আবু সুলায়মান: মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট প্রথম খন্ড: ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর ও মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন আল-আযহারী অনূদিত; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, জুলাই ২০০৯

[১০] সাইয়েদ কুতুব: আগামী দিনের জীবন বিধান: এ. কে. এম. নাজির আহমদ অনূদিত; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, তৃতীয় প্রকাশ, মার্চ ২০০৭

[১১] মুহাম্মাদ কুতুব: ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম: অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক অনূদিত; আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৩

[১২] মুসা আল হাফিজ: বাংলাদেশ ও ইসলাম আত্মপরিচয়ের ডিসকোর্স; শোভা প্রকাশ, মার্চ ২০২১

[১৩] মুহাম্মদ কামারুজ্জামান: আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম; শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০২

[১৪] আমির জামান ও নাজমা জামান: আমাদের মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে?; Institute of Family Development, Canada,2nd Edition, December 2015

[১৫] আবদুল মান্নান তালিব: বাংলাদেশে ইসলাম; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০২